শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
নববর্ষ সংখ্যা
২০২৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী সুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

৬৪ তম বর্ষ ● শুভ নববর্ষ ১৪৩২ সন ● প্রথম সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ ১

গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ) শ্রীদেবপ্রসাদ রায় ৪

অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর ৭

বেদবিদ্যা শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক ৯

নৈহাটির বড়মা শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায় ১১

কাশীতে কয়েকটা দিন শেষ (শেষ পর্ব) শ্রীসোমনাথ সরকার ১৩

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমুহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী ১৬

পুণ্য-পরশ-পুলক (১৮শ পর্ব) শ্রীবসুমিত্র মজুমদার ১৮

"শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র'র লিখিত
স্মৃতির আলোকে বিগতদিন" থেকে কিছুটা অংশ বিশেষ ২০

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 01-10-2024 to 14-02-2025) ২৪

কিছু স্মৃতিচারণ শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল ২৬

"সাধন স্মরণ লীলা" ২৯

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈকা শিষ্যা

সতাং প্রসঙ্গ

২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার, ১৯৫৯, পাটনা, ফ্রেজার রোড সময় আন্দাজ বেলা তিনটা। শ্রীশ্রীমহারাজ দিনের কীর্ত্তনের পর, স্নান মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও ভোগ নিবেদন সমাপন করে আপন কক্ষের দ্বার খুলে দিয়েছেন। খাটে বসে দশটার ডাকে আসা চিঠি পত্র গুলি পড়ছেন। চরণ দু'খানি প্রসারিত। পায়োনীয়র সম্পাদক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ লক্ষ্ণৌ হতেই তাঁর সঙ্গে আছেন— তিনি তাঁর স্ত্রী বিভামা এবং আমরা দু'চারজন যাঁরা তখনও ছিলাম, শ্রীশ্রীমহারাজের চরণতলে এসে বসলাম। তাঁর চিঠিপত্র পড়া শেষ হয়ে যেতেই পায়োনীয়র সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, "মহারাজ! এখনই আশাদিকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার কি মনে হয় শ্রীশ্রীমহারাজের মধ্যে ভগবানের অংশ আছে। তাতে দিদি বললেন, 'ভগবানের অংশ আবার কি? মহারাজই তো ভগবান! আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবার অনুরোধে দিদি বললেন, তাঁর কথা সংশয় পূর্ণ করবার জন্যে আর তো শুনবার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি যেমন প্রেমস্বরূপ তেমনই তিনি যে আবার জ্ঞান স্বরূপও তিনি যেমন "আত্মারাম" তেমনই তিনিই আবার "চৈতন্যরমণ"। তাঁর শ্রীমুখের কথামৃতের মধ্যে তাঁর চৈতন্যরমণের এই রস সম্ভোগটি উপভোগ করতে খুবই তৃষ্ণা হয়। আরও দিদি বলেছিলেন নাকি বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে যা আছে তাও আর একবার গুরু মুখে শ্রবণ করে নিতে হয়। কিছু বলুন না মহারাজ! এই এখন আপনার এই আসনে আমার পা ঠেকে ছিল, আমি লক্ষ্যও করিনি। দিদি তাড়াতাড়ি প্রণাম করে সরিয়ে রাখলেন। আমরা নানা অবান্তর কথা প্রশ্ন করি। কী করে আমরাও একান্তই সংশয় রহিত হয়ে প্রশ্ন করব, মাটির দেহ আমাদেরও কেমন করে কাঞ্চন হবে? বলেদিন মহারাজ।"

শ্রদ্ধেয় সুরেনদার একান্তই সরল ও উচ্ছ্বসিত এই সব কথায় শ্রীশ্রীমহারাজ হাস্য উদ্ভাসিত মুখে বললেন; "কীর্ত্তন তো দু'বেলাই শুনছ; "মাটির দেহ কাঞ্চন হবে গাওরে রাম হরে হরে।" কথাতে আর কী শুনবে? কথা দিয়ে আর তাঁর কথা কতই বলব। এর কি শেষ আছে? তিনি অনন্ত তাঁর কথাও তাঁরই মত অনন্ত।"—এইটুকু বলে শ্রীশ্রীমহারাজ হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইলেন। দেখলাম, কিছু জিজ্ঞেস না করলে তিনি চুপ করেই থাকবেন। এই মাহেন্দ্র ক্ষণটি এখনই ফুরিয়ে যাবে। তাই জিজ্ঞেস করলাম, "বাবা, একটি কথা আপনার নিকট বিশদ করে জেনে নিতে ইচ্ছা করে। ভাগবত ধর্মে পড়ছিলাম, দ্বাপরে যাহা রাসলীলা কলিতে তাহাই মহাসংকীর্ত্তন। বৃন্দাবন লীলা ও নবদ্বীপ লীলা একই সূত্রে গাঁথা। তাঁর সকল লীলার শ্রেষ্ঠ রাসলীলা দ্বাপরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আবার কলিতে সেই রাস রসই মহাসংকীর্ত্তন রূপে লীলায়িত। তাই কি মহাপ্রভু বলে গেলেন তিনবার, কলিতে "নামৈব কেবলম্ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" তাই কি কলিতে সেই রাস রস নামের মধ্যে এবং মহাসংকীর্ত্তনের মধ্যেই প্রকাশমান?"

পায়োনীয়ার সম্পাদক বললেন, "দাঁড়ান মহারাজ, উত্তরটা পরে শুনব। আগে আপনি প্রশ্নটা ভালো করে বুঝিয়ে বলুন। দিদি অনেক পড়াশোনা করেছেন, আগে প্রশ্নটাই বুঝি, তারপর উত্তর শুনব।"— তাঁর

কথার ভঙ্গীতে মহারাজ হেসেই ফেললেন। তারপর অল্প একটু কাল চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলেন "ইনি জিজ্ঞেস করছেন দ্বাপরে যা রাসলীলা ছিল কলিতে তাই কি নাম সংকীর্ত্তন? রাসলীলা মানে তাঁর রসের সম্যক প্রকাশ যে লীলাতে। কলিতে কি তাঁর সেই রসময় স্বরূপনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যেই সবচেয়ে উজ্জ্বলতম রূপে প্রকাশমান? তাঁর স্বরূপই হলো, রস। তাই জন্যে শ্রুতিতে বল্লেন, "রসো বৈ সঃ।" তাঁর এই রসের পূর্ণতম বিকাশ হয়েছিল দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণাবতারে রাসলীলায়। তাঁর সেই যে রস রাসলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপরে আবির্ভূত হয়েছিল— সেই রসই আবার কলিতে তাঁর নামের মহা সংকীর্ত্তনের মধ্যবির্ত্ততায় আবির্ভূত হয়েছে। নামের স্বরূপের সম্বন্ধে তাইজন্যে বল্লেনঃ—

"নামঃ কৃষ্ণশ্চিন্তামণি রস বিগ্রহঃ

নামই তাঁর রস বিগ্রহ। অবতার কল্প মহাপুরুষেরা যখন নামসংকীর্ত্তন করেন তখন তাঁদের ভগবদ্ উপলব্ধি তাঁদের উচ্চারিত নামের ভিতর সেই নামীর রসকে অবতীর্ণ করায়। তাই জন্যে হয়তো এমন বিশেষ কিছু নয়, তাঁর শুধু নাম কীর্ত্তনই করছেন কিন্তু তার রসেই আপামর সাধারণ মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট।

জিজ্ঞেস করলাম, "তাই কি বাবা, মহাপ্রভু নীলাচলে প্রথমে যে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন তাতে শুধু এই নামের পদটি গাওয়া হোতঃ—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।"

এই পদটিতেই প্রথম মহাসংকীর্ত্তনের উৎপত্তি।

শ্রীশ্রীমহারাজঃ—হ্যাঁ, নামের ভিতরে নামী আছেন। আর সেই নামীর পরমরস বর্ত্তমান আছেন। তাই জন্যেই তো নামের যথার্থ স্বরূপ কি? তার বর্ণনায় বল্লেনঃ—

"নামশ্চিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নাম নামিনোঃ।।"

শব্দব্রহ্ম এর মানে কি? তাঁর সমস্ত সৃষ্টিটিই শব্দময়। তাঁর প্রতিটি ভাবের দ্যোতক এক একটি শব্দ আছে। আবার সমষ্টি গতভাবে ওঁকারের মধ্যেই সমস্ত শব্দ বিধৃত। তাই জন্যে জগতে যত শব্দ আছে সমস্ত শব্দের উৎপত্তি ও ওঁকারে, আবার সকল শব্দ সকল মন্ত্র অবশেষে ওঁকারে এসেই পর্য্যবসান লাভ করে। কারণ অ উ ম ও হসন্ত—এর মধ্যেই জগতের সকল শব্দের আদি ও অন্ত। কারণ অ উ ম এই তিনটি লাগবেই প্রতি শব্দের উচ্চারণে। আর হসন্ত কাকে বলে? না ঐ অ উ ম উচ্চারণের পর যে ঝঙ্কার বা রেশ থেকে যায় তাহাকেই বলে। সেই ঝঙ্কারের আর বিরাম নেই। সেই ঝঙ্কার সৃষ্টির আদিতে সেই যে ঝঙ্কৃত হয়েছিল আজও তা ঝঙ্কৃত হতেছে। সেইটিই অনাহত নাদ। যাঁদের সাধনার ফলে শ্রবণের ক্ষমতা জন্মেছে তাঁরাই সেই অনাহত ধ্বনি শোনেন যে ধ্বনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে ধ্বনিত হয়েছে এবং আজও যার বিরাম নেই। ঐ হসন্তটি সেই ঝঙ্কার বা রেশ। যেমন একটা ঘন্টা খুব জোরে বাজিয়ে দিলে— বাজনার শব্দের একটা রেশ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তেমনই ওম্ উচ্চারণের পর যে ঝঙ্কার

থেকে যায় সেইটিই অ উ ম এর পর হসন্ত। সৃষ্টির প্রতীক এই ওঁকার।"

শ্রীশ্রীমহারাজ এতদূর বলে লক্ষ্ণৌয়ের পায়োনীয়র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সুরেন বাবুর পানে চেয়ে বললেন, লক্ষ্ণৌতে রাধাকমল মুখার্জিকেও তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি এই প্রতিটি শব্দের মধ্যেই তাঁর প্রকাশের কথা বলেছিলাম। আবার অ উ ম ও হসন্ত এর অভিব্যক্তি হচ্ছেঃ বিন্দু, নাদ, কলা।

শ্রীচিন্ময়ানন্দ প্রশ্ন করলেনঃ "গুরু স্তবে আছেঃ— 'বিন্দু নাদ কলাতীতম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' এর অর্থ কি?

শ্রীশ্রীমহারাজঃ— হ্যাঁ, ঐ যে এখনই বললাম না, অ উ ম ও হসন্ত বা অনাহত ধ্বনি এদের অভিব্যক্তি হচ্ছে, বিন্দু, নাদ, কলা। কিন্তু তুরীয় অবস্থা যেটি, সেটি এই বিন্দু নাদ বা কলারও অতীত। শ্রীগুরু হচ্ছেন এই তুরীয় বা transcendental পার্সোনালিটি। তিনি সবের পারে। তিনি সত্ব রজ তমের পারে— জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তির পারে—বিন্দু, নাদ, কলার পারে তাই গুরু স্তবে বললেন,—

"বিন্দু নাদ কলাতীতম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

পায়োনীয়র সম্পাদক সুরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ট্র্যান্‌সেন-ডেন্টাল বা তুরীয় অবস্থাটি কী মহারাজ? সেটি আগে বুঝি তার পর অন্য কথাগুলি বুঝব।"

শ্রীশ্রীমহারাজঃ— "তুরীয় অবস্থাটি যে কি? তাহা যে মুখে বোঝানো যায় না। সেটি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। গীতায় ভগবান আপনার এই স্বরূপ—তিনি যে একাধারে যুগপৎ immanent এবং transcendental তাহা বহুবার বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছেন। গীতায় ভগবান বললেন—

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেপবস্থিতঃ।।"

আমার মধ্যেই সবাই রয়েছে, আমি কিন্তু কারো মধ্যে নেই। আমি সর্ব্বদাই উদাসীন—নির্লিপ্ত—অথচ এই সমস্ত বিশ্বচক্র আমারই সূত্রে গ্রথিত। যেমন মণি হারের মণিগুলি একটি সূত্রকে অবলম্বন করে গাঁথা থাকেঃ"

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং
সূত্রে মণি গণা ইব।"

তাঁর এই ভাবটি গীতায় নানা স্থানে নানা ভাবে নানা উপমায় বহুবার বলেছেন। গীতার মূল পুরুষোত্তম তত্ত্বটিও যে তাই-ই। তিনি শুধু নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ন'ন।

গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

বাইরের অনুশাসন গৌন-মন্দাধিকারীর বেলায় তার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিযুক্ত হলে তার প্রয়োজন থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায়, 'তখন ভিতর থেকে কেউ বলে দেয়— এরপর এই-এই।'

মানুষ সামাজিক জীব, তার সমস্ত চরিত্র ও সংস্কার শিক্ষার ফল। সুতরাং জন্মেই সে যে কোন প্রকারেই হোক, শিক্ষকের অধীন। অতএব একদিক দিয়ে দেখতে গেলে গুরুভাব একটা সার্বভৌম সত্য। কিন্তু মানুষ শেখে যেমন বাইরের অনুশাসনে, তেমনি আবার ভিতরের প্রেরণাতেও। বাইরে আর ভিতরের অন্তর্যামী— দুই-ই গুরু। তার মধ্যে অন্তর্যামী আরও অন্তরঙ্গ। তিনিই সদ্‌গুরু। কর্তব্য, শিষ্যের মধ্যে অন্তর্যামীকেই প্রবুদ্ধ করা, তাঁর আলোতে পথ চলতে শেখানো। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই-ই করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে অর্জুনকে বলেছেন, 'আমার যা বলবার, তা বললাম, এখন যথেচ্ছসি তথা কুরু (ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদ শেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।। (১৮, ৩৬)। আজকাল কজন গুরু তা বলতে পারেন?

মানুষ যখন জাগে তখনই সে প্রথম দেখতে পায় নিজের ভিতরটা। অর্জুনও দেখতে পেলেন, নইলে তাঁর এই উপলব্ধি হত না— কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ (২/৭)। যেই জাগলেন, অমনি দেখলেন নিজের মধ্যে একটা মালিন্য, একটা আবরণ পড়ে রয়েছে। এই কার্পণ্য দোষ তাঁর চিত্তদর্পনকে ঢেকে রেখেছে। যে চিত্ত দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে হবে, সবকিছু কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে, তার এই অবস্থা। যেমন টর্চ নিয়ে বেরিয়েছি অন্ধকারে পথ দেখব বলে, সে টর্চের কাঁচটা যদি মালিন্যের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহলে পথ দেখাবে কে? তিনি দেখতে পেলেন কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ (৭), আর তার ফলে তিনি হয়ে পড়েছেন ধর্মসংমূঢ়চেতা (৭), ধর্মের যে পথ, কোনটা যে ধর্ম, সে সম্বন্ধে তাঁর মূঢ়তা এসেছে। জাগরণের সময় এমনটিই ঘটে থাকে। আমি বুঝে উঠতে পারছিনা, কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা অধর্ম। আমি নিজে পথ খুঁজে পাচ্ছিনা। যখন আমি জাগলাম, তখন যাঁকে আমি সামনে দেখলাম প্রোজ্জ্বল ভাস্বর রূপে, আচার্য রূপে, গুরুরূপে তাঁকে পেলাম পরম সুহৃৎরূপে তাঁরই কাছে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল: 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।'

এই হল জাগরণের দ্বিতীয় লক্ষণ। অর্থাৎ জাগবার পর প্রথম নিজের ভিতরের মালিন্যকে আমি দেখতে পেলাম। সেই নিজের ভিতরের মালিন্যকে দেখবার সঙ্গেই আমার মনে এখন জিজ্ঞাসা জাগল। সে জিজ্ঞাসা শ্রেয় সম্বন্ধে। এতদিন শ্রেয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগেনি। এতদিন শুধু প্রেয়কে আমি চিনেছিলাম। প্রেয় মানে যা আমার কাছে ভালো লাগে। সেই ভালো-লাগা জিনিসের দিকেই আমি ঝুঁকেছিলাম এবং সেই ভালোলাগা জিনিসকেই আমি সংগ্রহের জন্য নানাভাবে নানা জায়গা থেকে যোগাড়ের ফিকিরে ছিলাম। তার দ্বারাই আমি মনে করেছিলাম, আমার জীবন সুখে কাটবে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা জাগল

শ্রেয়ের, প্রেয় থেকে ফিরলাম শ্রেয়তে।

এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের কথা স্মরণীয়। সেখানেও সেই একই কথা। যমরাজের কাছে নচিকেতা যখন এইভাবে তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই শ্রেয়ের কথা। সেখানে যমরাজ নানা প্রেয়ের প্রলোভন তাঁর সামনে উপস্থিত করে বলেছিলেন, "এসব তুমি কী জিজ্ঞাসা করছ? ওসব রেখে দাও, তোমাকে আমি অনন্তকাল জীবন দান করছি, যতকিছু দিব্য সুখ ভোগ— শুধু ঐহিক সুখ নয়, পারলৌকিক স্বর্গীয় যে নানারকম সুখ, তা সবকিছু তোমার সামনে এনে দিচ্ছি, রথ, অশ্ব, গজ, নৃত্যগীত, অপুরদিব্য নানা সুখের উপকরণ তোমার সামনে অঢেল হাজির করছি। কিন্তু নচিকেতা তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। তিনি একমাত্র শ্রেয়ের জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। এখানেও তেমনি অর্জুন বলছেন: সেইটিই তুমি নিশ্চিতংব্রূহি অভ্রান্তভাবে তুমি আমাকে শ্রেয়ের পথনির্দেশ করে দাও।"

এই শ্রেয়ের পথনির্দেশ ভিক্ষা এই যে পরম চাওয়া, এরই নাম আমাদের দেশে দেওয়া হয়েছে আত্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। আমাদের যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্র, তার প্রথম সূত্রই হল, 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই হল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা জানার আকুল আকাঙ্ক্ষা। বুদ্ধির কৌতূহল মাত্রকেই জিজ্ঞাসা বলে না। জিজ্ঞাসা কিসের থেকে জাগে? মুমুক্ষা থেকে মুক্তির ইচ্ছা থেকে। যেমন যখন অন্নে টান পড়ে যায়, একমুঠো খাবার যদি না পাই, তাহলে দেশজোড়া সেই তীব্র সঙ্কটে বোঝা যায় যে কাকে বলে বুভুক্ষা আর তখনই সেই বুভুক্ষা থেকে খাদ্যের আকুল ইচ্ছা জাগে। তেমনি আমার ভিতরে মুমুক্ষা জাগবে, মুক্তির ইচ্ছা জাগবে। কীরকম মুক্তির ইচ্ছা? যেন চারিদিকে আগুন জ্বলছে, 'হুতবহ পরীতং গৃহমিব' সেই গৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পেতে চাই বা শীতল জলে অবগাহন করতে চাই। যদি তখন কেউ বলেন সামনে মণিমুক্তার পাহাড় করে দিচ্ছি, এসব গ্রহণ করুন, নিয়ে যান, তখন যেমন জলে ঝাঁপ দিয়ে শুধু নিজেকে শীতল করতে চাইব, জলের জন্য যেমন আমার তৃষ্ণা জেগে উঠবে, অন্য কোনও কিছুর জন্য নয়, ঠিক সেই ভাবে যখন আমার জীবনের জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের জন্য, সঙ্কট থেকে ত্রাণ-পাবার জন্য একান্ত স্পৃহা জাগে, তারই নাম হচ্ছে জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসা নিয়ে অর্জুন তাঁর কাছে বলছেন, 'আমাকে নিশ্চিতভাবে বলো'। এইটিই হল প্রকৃত জিজ্ঞাসা। বুভুক্ষা, পিপাসা এইসব জৈব তৃষ্ণার মতো যখন দেখা দেয় আত্মিক তৃষ্ণা, তখন তাকেই বলে মুমুক্ষা।

প্রথমত সেইজন্য আমাকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। বলবেন তিনি নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি কী শুধু বলেই যাবেন? কার উদ্দেশ্যে বলবেন কোন্ সম্বন্ধের সূত্রে? আমাদের দেশে আজকাল নানারকম ভাষণ হয় সভাসমিতিতে। কিন্তু সবক্ষেত্রে এইসব সভাসমিতি ভাষণের দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে যথার্থ অনুপ্রেরণার সঞ্চার করা যায় না। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সেখানে সম্বন্ধ নেই। সভার অনেক লোক নানা জ্ঞান লাভ করবার জন্য বা শুধু শুনবার কৌতূহল নিয়েই সমবেত হন, কিন্তু শিষ্যরূপে সেখানে কেউ আসেন না। শিষ্য মানে অনুশাসন যোগ্য। সেই অনুশাসনের আকাঙ্ক্ষা নেই মনে। আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যখন কেউ আসেন, তখন তাঁর হৃদয়ে গুরু সেই তত্ত্বটি সঞ্চারিত করে দেন। সভা সমিতিতে কারুর সম্বন্ধসূত্র নেই, বক্তার সঙ্গে শ্রোতার নেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেননা শুশ্রূষু হয়ে শিষ্যরূপে সেখানে কেউ

আসেন না। এমনি শুনবার জন্য, জ্ঞানের কৌতূহল মেটাবার জন্য হয়তো আসেন। কিন্তু সেই শিষ্যও গুরুর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধসূত্র যখন স্থাপিত হয়, তখনই শুধু সেই অনুশাসন তার কাছে গ্রহণীয় হয়।

উপনিষদের সেই অনুপম উপমা মনে পড়ে শিষ্য হলেন 'অধরারণি' আর গুরু হলেন 'উত্তরারণি'। অরণি মানে হল অগ্নিমন্থনের কাঠ। দুটি কাঠের ঘর্ষণের ফলে আগুন জ্বলে উঠবে। আগেকার দিনে যজ্ঞে সমিধ আহরণ করে অগ্নিপ্রজ্বালন করা হত। সেই অগ্নিমন্থনের বিশিষ্ট প্রক্রিয়াটি হল দুটি কাঠের বা দুটি সমিধের পরস্পর ঘর্ষণ। একটি অধরারণি, অধর কাষ্ঠ, নিচের এই কাঠটি হল শিষ্য। উত্তরারণি বা উপরের কাঠটি হলেন গুরু। অধর কাষ্ঠ Passive বিশেচষ্ট হয়ে থাকে। সে নিজেকে যেন পেতে দেয়, মেলে ধরে তার আপন সত্তাটি। এখানে অর্জুন যেমনি নিজেকে তাঁর চরণে বিছিয়ে দিলেন, পেতে দিলেন শিষ্যস্তে হহং' বলে, যেমনি তাঁর হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন, তখনই তার উপর উত্তরারণি, উর্ধ্বের যে অরণি তা স্থাপিত হল। তারপর ঘর্ষণ চলতে থাকল। এই ঘর্ষণকালে অর্জুন এক একবার জিজ্ঞাসা করছেন, সেই জিজ্ঞাসার দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে আরও উৎসাহিত হয়ে আচার্য শ্রীভগবান বলছেন। এই বলতে বলতে তবে সেই আগুনটা হঠাৎ জ্বলে উঠল, এবং সেই আগুন জ্বলে উঠে অর্জুনের সমস্ত অজ্ঞানকে পরিশেষে ভস্মীভূত করল। তাই অর্জুন বললেন, ''শিষ্যস্তেহহং শাধিমাংত্বাং প্রপন্নম্''।।(৭)

এই শ্লোকটিতে আর একটি বিশেষ কথা রয়েছে, সেটি হল 'প্রপন্ন'। গীতার প্রারম্ভই হল প্রপন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং শেষও প্রপন্নতার পরাকাষ্ঠায়। প্রপন্নের অর্থ যার মধ্যে জেগেছে প্রপত্তি অর্থাৎ শরণাগতি। মানুষ যখন ভগবানে প্রপন্ন হয়, আচার্যতে যখন প্রপন্ন হয় তখনই আচার্য তাকে এই বিজ্ঞান বা জ্ঞান দিতে পারেন। গীতায় বার বার আদিতে যেমন, মধ্যেও তেমনি, আবার অন্তেও সেই এক প্রপত্তি। প্রপত্তি দিয়ে যার আরম্ভ আর এই প্রপত্তিতেই শেষ। এখানে প্রপত্তি শুধু শুনবার জন্য, অনুশাসনের জন্য। তারপর তার সঙ্গে ক্রমশঃ আরও নিবিড় ঐক্যের জন্য প্রপত্তি। এই জন্য প্রপত্তিও ক্রমশঃ গাঢ়তর, গাঢ়তম হবে, তা আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব, যখন শ্রীমদ্ভগবদ গীতায় আমরা এগিয়ে যাব। শিষ্য যখন তাঁর কাছে এইভাবে অনুশাসনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এল, একান্তভাবে প্রপন্ন হল, তখন সেই অনুশাসনের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য আচার্যের শ্রীমুখ থেকে অনুশাসনের বাণী নির্গত হতে লাগল।

সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা হৃষিকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।।২।৯

সঞ্জয় কহিলেন, শত্রু সন্তাপদাতা জিতনিদ্র অর্জুন গোবিন্দকে এইসব কথা বলার পর 'আমি যুদ্ধ করব না' এই কথা বলে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন।

ব্যাখ্যা— যিনি নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করেছেন, সেই মহা উদ্যোগী পুরুষকে বলা হয় গুড়াকেশ। গোবিন্দ শব্দের শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থ 'গোভির্বেদান্ত বাক্যৈরেব বিদ্যতে লভ্যতে ইতি গোবিন্দঃ'। 'গো' শব্দ তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি-আদি বেদান্ত বাক্যবাচক। যিনি এইসব মহাবাক্য দ্বারা লভ্য, তিনিই গোবিন্দ।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ'। ২।১০

(ক্রমশঃ)

অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী

শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় আর তৃতীয় দশকের মোহনা। উচ্চ শিক্ষাপাবার জন্য সিলেট, চাঁটগাঁ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ—এমনি সব দূরের জায়গা থেকে যুবকেরা ভিড় করে আসছেন কলকাতায়। ভাল পড়াশুনো মানেই ভাল চাকরী, সঙ্গে ইংরেজিতে পারঙ্গম হলে তো আরও ভালো... হিন্দু কলেজ, ততদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজ। কলকাতায় আরও ছিল স্কটিশচার্চ, সেন্টজেভিয়ার্স, সেন্ট পলস কলেজ-এছাড়া আরও অনেক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার হাজারো আলোর কণিকা অনেক দূর থেকে টেনে নিয়ে আসে প্রশ্নাতুর আর জীবন-বুভুক্ষু হাজার হাজার যুবাজনকে।

শ্রীহট্ট বা সিলেটের সাধুহাটি গ্রাম। দামেরা বংশপরম্পরায় জমিদার ছিলেন সেখানকার। আনন্দমোহন দাম শুধু জমিদারই ছিলেন না, গ্রামের একজন ডাক্তারও বটে। কাছে এসে কেঁদে পড়লেই মকুব হ'য়ে যায় খাজনা। আত্মীয়স্বজন রাগ করেন, বকেন, তারপর হাল ছেড়ে দেন। সদানন্দ, মৃদুভাষী বদলালেন কোথায়'?... দিন সমান যায় না। আনন্দ মোহনকে ধরল মধুমেহ। তখনকার দিনে অজানা, কঠিন অসুখ। নিদান জানা নেই কোনো। ধারণা ছিল খাওয়া-দাওয়া খুব কমিয়ে দিতে হয় এই রোগে। তাই করলেন আনন্দমোহন। সবল শরীর হ'ল শুকনো দড়ির মতো। মধুমেহ কমলো কি কমলোনা—দুর্বল শরীর হয়ে পড়ল মারাত্মক কালাজ্বরের শিকার। সেই রোগেই অকালে চ'লে গেলেন আনন্দমোহন।

তাঁর বড় ছেলে অবনীমোহন তখনো ছাত্র। একসঙ্গে বহু গুরুভার এসে পড়লো কাঁধে। লোভী আত্মীয়, কুটিল প্রতিবেশীদের হাত থেকে জমিদারী বাঁচিয়ে ঠিক মতো চালানো, ছোট ভাইদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা, একমাত্র বোনের মর্যাদা অনুযায়ী বিয়ের তোড়জোড়, সেই সঙ্গে নিজের পড়া। শক্তজমিতে একাই দাঁড়াতে হবে ভবিষ্যতে। দক্ষ নাবিকের মতো সংসারের নানা বিপরীত স্রোত বুঝে সামলে চলতে শিখলেন অবনীমোহন। এ' ব্যাপারে একেবারেই বাবার মত ভোলাভালা নন তিনি। মাঝে মধ্যে কলেজের ক্লাস বাদ দিয়েও তাঁকে দেশে আসতে হয়।

অবনীমোহন কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র—থাকেন অগিলভি হস্টেলে। আরও অনেক বন্ধু, সম্পর্কিত ভাইরাও থাকেন সেখানেই বা আশেপাশের সাময়িক আবাসে। জ্যাঠতুতো দাদা অনংগমোহন দাম প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সেখানেই দর্শন মিলল সুভাষ চন্দ্র বসুর। অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা অচিরেই। অধ্যাপক ওটেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাতে অসুবিধে নেই কিন্তু সেই সঙ্গে নিন্দার টগবগের গরলে রোজ ভাজা ভাজা হতে হয় প্রাচ্য তথা ভারতীয় সভ্যতাকে। মুখ বুজে মাথা নীচু করে সহ্য করতে হয় শিক্ষার্থীদের। এই শ্বেতাঙ্গ একদর্শিতার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ জমতে থাকে দিনের পর দিন। ওটেনকে শিক্ষা দেবার ছক বাঁধলেন সুভাষ, অনঙ্গ আরও কিছুজন ছাত্র। শিক্ষা দেওয়াও হলো কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে চলে যেতে হল অন্য কলেজে আর অনঙ্গ মোহন কিছুদিন দেশের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে

আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। তখন থেকে সুভাষের নানা রাজনৈতিক গতিবিধির সদাসঙ্গী তিনি।

অন্যদিকে অগিল্‌ভি কলেজ হস্টেলে ঘটে যাচ্ছিল এক নিঃশব্দ বিপ্লব। তার গতি প্রকৃতি একেবারেই অন্যবিধ। অবনীমোহন আর তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন একটু ডানপিটে ধরণের। পড়াশুনা ছাড়া খেলাধুলোতেও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন সবাই। একবার ট্রাপিজ ধরণের একটা শক্ত কসরত করতে করতে অবনীমোহন একেবারে অনেকটা উচ্চতা থেকে ভূপতিত হয়ে গেলেন। ভাগ্যিস সেইরকম মারাত্মক কিছু হয়নি তবে মাথায় প্রচণ্ড চোট লেগেছিল। দুদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসায় সেরে উঠলেও মাথার কিছুটা চুলের কিছুটা অংশ বরাবরের জন্য সাদা হয়ে রইল।

একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করে এই ডানপিটের দল নিজেরাই হতবাক্ হয়ে গেলেন। হস্টেলের যৌবন-জলতরঙ্গের মধ্যে কে এই কিশোর-আত্মস্থ-আধ্যাত্মিকতার নিজস্ব এক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন? পদ্মপলাশ দুই নয়ন, কোন সুদূরের পিয়াসী তাই যেন তাঁর চোখে ধরা পড়ে না অনেক কিছুই। খেলাধুলোয় অনাগ্রহী; মনে হয় যেন কক্ষের দুয়ারের পিছনে পূজা-জপে-তপে কাটে সময়। কৌতূহলী হলেও কেউ ঘাঁটান না বেশি ছেলেটিকে-আনমনেই থাকেন তিনি। এক সকালে হোস্টেলে শোরগোল পড়ে গেল, মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় উধাও, কোথায় সেই নির্বিরোধী কিন্তু বেশ একটু অন্য ধরনের কিশোরটি?

এইসব কথার মুলে যেতে হ'লে ফিরে যেতে হবে কিশোরটির সেই জন্ম মুহূর্তে। মেদিনীপুর ১৯০৪ সাল, ১৭ই ডিসেম্বর। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিনয়িনী দেবীর ঘর আলো করে ভূমিষ্ঠ হলো পুর্ণিমার চাঁদ অথবা প্রত্যুষ প্রসূনের মতো স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল এক পুত্র সন্তান। ছেলেটির যখন দেড় বছর বয়স, বাবা-মা তাকে নিয়ে চললেন দেওঘরের তপোবন আশ্রমে, তাঁদের গুরুদেব বালানন্দজীর দর্শনার্থে। গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন শিশুকে। শব্দহীন কী বার্তা বিনিময় হল ঋষি আর শিশুর মধ্যে শুধু কালই তা জানে। মনে পড়ে যায় মহাভারতের অন্তে বিদুর আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে আত্মিক যোগসূত্র স্থাপনের কথা।

আন্তরিক সেই টান সতেরো বছরের কিশোরটিকে আর প্রবেশ করতে দিলোনা সংসারের চক্রব্যূহে। স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরত ছাত্রটি কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এলেন দেওঘর করণীবাদে গুরুবালানন্দজীর কাছে। তপোবন হলো বাসস্থান। দীক্ষা লাভ হল ১৯২১ সালে। গুরুপদে-স্থিত, ঈশ্বর-সমর্পিত অস্তিত্ব সেদিন থেকেই। এতো নিবিড় সেই সম্পর্ক যে একদিন বালানন্দজী ব'লে উঠবেন, 'মোহনই আমি, আমিই মোহন!'

ক্রমশঃ

ভুলসংশোধন

"জন্মতিথি" ২০২৪ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। ঐখানে ১৭ই ডিসেম্বর হবে।

বেদবিদ্যা

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

যদি আমরা ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই বেশ কিছুদিন আগেও আমাদের পঠন-পাঠন শুরু হত গুরুগৃহে। সেখানে মুনিপুত্র, রাজপুত্র, সদাগরপুত্র—এদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে কোন আশ্রমবালিকাও যদি পঠনেচ্ছু হোত, তবে সেও পড়ার অধিকার পেত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা-এরকম অনেক বিদুষী নারীদের কথা আমরা সেখান থেকেই জানতে পারি।

তখন শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ছিল? প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পাঠও যেমন শুরু হোত, তেমনই পুঁথিপাঠের গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। এবার আশ্রমের বৈদিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে একটা আলোচনা করি। প্রথমেই দেখি সামবেদের ঋষি সশিষ্য শান্তি মন্ত্র পাঠ করছেন, 'ওঁ সহ নৌ অবতু'—হে ঈশ্বর আমাদের সমানভাবে পালন করুন, এরপরই 'সহ নৌ ভুনক্তু' গুরু শিষ্যের যে শিক্ষার আদান প্রদান হচ্ছে তার সুফল যেন সকলে সমানভাবে লাভ করে। এরপর, ''সহ বীর্যং করবাবহৈ', শক্তি ও বীর্য যেন গুরু শিষ্যের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত হয়। ''তেজস্বীনাবধীতমস্তু", আমাদের অধীত বিদ্যা যেন পুঁথি পাঠেই আবদ্ধ না থাকে-একে যেন আমরা কার্যকরী বিদ্যাতে রূপান্তরিত করতে পারি। 'মা বিদ্বিষাবহৈ' ভ্রমপ্রমাদে অনুরক্ত হয়ে আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না হই। এই মন্ত্রের মাধ্যমে আচার্য ও ছাত্র সমমনোভাবাপন্ন হয়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তারপরেই শুভারম্ভ হচ্ছে প্রথাগত বিদ্যা।

এরপর দেখি অথর্ববেদের ঋষি সশিষ্য প্রার্থনা করছেন—''ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজনাঃ",

আমাদের কর্ণ যেন সর্বদা শুভ বাক্যই শ্রবণ করে, অশুভ কোন বাক্য যেন কর্ণগোচর না হয়, আমাদের চক্ষু দিয়ে চারপাশের শুভ দৃশ্যই যেন দেখতে পাই, অশুভ কোন দৃশ্য যেন চক্ষুগোচর না হয়। প্রথম থেকেই ছাত্রদের এইভাবে শিক্ষা দিলে তারা কখনোই কুপথে যেতে পারবে না। ছাত্রাবস্থায় মন থাকে অতি কোমল, তখন তাকে যা শেখানো হয় উত্তরকালে সেটাই তাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়, এখনও আমরা দেখি ছোটবেলায় যা শিক্ষা লাভ করেছিলাম বড় হয়েও আমরা তারই অনুসারী হই; শৈশবে অধীত বিদ্যা আমাদের মনের গহন গোপন কোণে সুপ্ত হয়ে থাকে, তাই বাল্যকালে সুশিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

আচার্য তাঁর শিষ্যদের আপন আপন স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা দান করতেন। সৎ শিক্ষা-প্রদানের শেষে তাদের জীবনে চলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান উপদেশও দিতেন যা কিনা জীবনে একান্ত

অপরিহার্য। এই অমূল্য উপদেশ আমরা পাই কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদের একাদশ অনুবাকে। এখানে আচার্য আমরা বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষাদানের শেষে গুরুগৃহ বাসকারী শিষ্যকে অবশ্য পালনীয় কিছু উপদেশ প্রদান করেছেন। এতে প্রথম কথাই হল ''সত্যং বদ'' এবং তার পরই ''ধর্মং চর''। সদা সত্য কথা বলিবে—এতো শাশ্বত উপদেশ। জন্ম থেকে জ্ঞান হয়েই আমরা একথা শুনেছি। এর জন্য যদি শাস্তি পেতে হয়, বকুনি খেতে হয় তবুও ''সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্'', কোন অবস্থাতেই সত্য কথা বলা থেকে বিরত হয়োনা। এরপর 'ধর্মং চর'— অর্থাৎ স্বধর্ম আচরণ কর। এখানে ধর্ম কিন্তু একটু অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন বালক বালিকার ধর্ম বিদ্যাচর্চা, গুরুজনেদের নির্দেশ পালন করা ইত্যাদি, এরপর আসে গার্হস্থ্য ধর্ম। বালক-বালিকারাই লেখাপড়া শেষ করে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করেছে, এবার শুরু হবে গার্হস্থ্য জীবন। বাল্যকালের শিক্ষাই তাদের অনুপ্রাণিত করবে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করে সফল ভাবে এগিয়ে যেতে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্মো ভয়াবহঃ'' অর্থাৎ যে যার নিজের ধর্মকেই আঁকড়ে বেঁচে থাক। পরধর্ম দেখতে ভালো হলেও কিন্তু আমার জন্য উপকার না করে অপকারই হয়তো করবে।

আচার্য তাঁর ছাত্রদের বিদায়বেলায় আরও বলছেন, ''সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্''। সত্য কথা বলবে কিন্তু সেই সত্য যেন কাউকে আঘাত না করে, এমন সত্য বলবে না যাতে দেশের দশের বা সমাজের কোন অপকার হয়।

'ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্'—স্বধর্ম আচরণ থেকে বিরত হবেনা কিন্তু এমনভাবেও ধর্মাচরণ করবে না যাতে অপর কারও বিরক্তি জন্মায় বা অনিষ্ট হয় এরপর আসছে কুশলের কথা, ''কুশলান্ন প্রমদিতব্য''—দেশের, সমাজের এবং নিজেরও মঙ্গল সাধন হয়, যে কাজে, তাতে উদাসীন থাকবে না। এরকমভাবেই গুরুরা তাঁদের ছাত্রদের সর্বতোভাবে সংসারের উপযোগী করে পাঠাতেন।

বর্তমান সময়েও যদি আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলে তারা জগতে সর্বদাই নির্ভীকভাবে সসম্মানে বাস করতে পারবে।

> ''তোমরা ভালোবাসার জানো কী। তোমাদের তো সব স্বার্থান্ধ ভালোবাসা। ভগবানের মতো কে ভালোবাসতে পারে? জেনে রেখো—ভগবানের ভালোবাসার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই।''
>
> —শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

নৈহাটির বড়মা

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

আসন্ন নববর্ষে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে শুরু করছি মায়ের আরাধনা। নববর্ষে কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর সব মায়ের মন্দিরে মন্দিরে পুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। উপছে পড়া ভীড় ঠেলে মাকে দর্শন করা ভক্তদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে।

এবার আমি নৈহাটির 'বড়মা'র মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু কথা লিখতে বসেছি। মাকে গোটা ফল দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। ভক্তদের দেওয়া প্রচুর শাড়ি মায়ের চরণে জমা হয়। শুধুমাত্র একদিনের কর্মযজ্ঞ নয়—বছর বছর একই নিয়ম পালিত হয়ে আসছে। বলা হয় নৈহাটির বড়মা সবার। মায়ের পুজোয় কত মানুষের উপকার হচ্ছে—বেনারসী থেকে ঢাকাই জামদানি, তাঁতের শাড়ি এছাড়াও আরও কতকিছু। ভক্তদের দেওয়া শাড়ি বড়মাকে পরানো হয় ঠিকই কিন্তু যে বিশাল পরিমাণে শাড়ি পড়ে, তা মানুষজনের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। বড়মার বিশেষ বিশেষ পুজোর পরেরদিন-মন্দির চত্বরে বস্ত্রদানের আয়োজন করা হয়, বেনারসী, দামী দামী শাড়িও দান করা হয় দুঃস্থ কন্যাদের জন্য।

কালীপুজোর দিন মায়ের পুজোতে হাজার হাজার ফল পড়ে। সেইসব ফল আলাদা আলাদা করে ভাগ করা হয়। এরপর সেই ফলগুলি পৌঁছে যায় নৈহাটির সরকারি হাসপাতালগুলিতে। রোগীদের হাতে হাতে ফল তুলে দেওয়া হয়। মায়ের পুজোর ফল খেয়ে সুস্থ হয়ে যান অনেকেই— এমনটাই বিশ্বাস ভক্তদের।

প্রায় একশত বছর আগে ভবেশ চক্রবর্তী ও তাঁর চার বন্ধু মিলে নবদ্বীপে ভাঙা রাস দেখতে যান। সেখানে গিয়ে বড় বড় মূর্তি দেখে তাঁরা অভিভূত হয়ে যান। বিস্মিত হয়ে নৈহাটিতে এক বিশাল আকার মূর্তি গড়ার পরিকল্পনা করেন। তাই ভবেশকালীও বলা হয়। কথিত আছে, এই পুজো ভবেশ চক্রবর্তীই স্থাপন করেছিলেন, তারপর বিশাল আকার মূর্তির জন্য 'বড়মা' নাম হয়ে যায়। নৈহাটিতে বড়মার স্থায়ী মন্দির আছে। প্রতিদিন ভক্তদের বিরাট লাইন পড়ে। গায়ের আভরণ থেকে ভোগ, পুজোর সামগ্রীর সমস্ত খরচ থেকে সবকিছুর ভার, সাধারণ ভক্তরাই বহন করে।

রাজস্থান থেকে আনা কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি এই একশত বছরের পুজোয় একশত ভরি সোনায় সাজিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল বড়মার। বড়মার মূর্তির সামনে বসছে অখণ্ড জ্যোতি, যার একটানা জ্যোতি বারো বছর ধরে জ্বলবে। বড়মা কারোর ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেন না। একুশ ফুট উচ্চতায় একবার বড়মাকে সাজালে দর্শনের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান সব ধর্মের মানুষেরই অবাধ প্রবেশ বড়মার মন্দিরে। এখানে ধর্ম যার যার—বড়মা সবার। তখন আর কালীপুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেনা। এখন নৈহাটির বড়মার মন্দিরে গেলেই দেখতে পাবেন, কষ্টি পাথরের

সাড়ে চার ফুটের বড়মার মূর্তি। যে মূর্তিকে একশত ভরি সোনার গয়নায় সাজানো হয়েছে।

বড়মার কষ্টিপাথরের এই মূর্তির শুদ্ধিকরণ তিথিও নক্ষত্র মেনে করা হয়েছে। গীতাপাঠ, মহামৃত্যুঞ্জয় পাঠ, হোমযজ্ঞ সবটাই নিয়ম মেনে করা হয়েছে। এই গোটা বিষয়টিতে যুক্ত ছিলেন দেশের তাবড় তাবড় পুরোহিতগণ। কোজাগরী পক্ষ্মীপুজোর দিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করা হয়েছে। বড়মার পুজোতে প্রায় চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার কিলো ভোগ রান্না হয়। এই ভোগ সমস্তটাই গাওয়াঘিতে রান্না করা হয়। এই পুজোতে কোনো চাঁদার ব্যবস্থা নেই। ভক্তরা স্বেচ্ছায় যে অর্থদান করেন, তার থেকেই পুজো হয় বড়মার। জাগ্রত বড়মার পুজো শুরু না হলে নৈহাটির আর কোনো পুজো হয় না। আবার বিসর্জন না হলে, নৈহাটির কোনো কালীঠাকুরের বিসর্জন হয় না।

"ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়,
মিছেই ভ্রম ভূমণ্ডলে
ভুলোনা দক্ষিণাকালী
বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে অন্তরের অনন্তকোটি প্রণাম। সবাইকে শুভনববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"ফুটিয়া উঠিবে চিত্তকমল তোমার চরণপরশে,
ঝরিয়া পাড়িবে অশ্রুনিচয়, ভুলিয়া আপন আবেশে।
আমার ব্যথার মালাটি টুটিয়া
তোমার চরণে পড়িবে লুটিয়া,
চরণ নূপুর উঠিবে বাজিয়া ডাকি লব পথ-প্রান্তরে।"

—শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী

কাশীতে কয়েকটা দিন (শেষ পর্ব)

শ্রীসোমনাথ সরকার

সন্ধ্যায় আশ্রমে গিয়ে আশ্রম প্রধান শ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারীজিকে প্রণাম করে অন্নপূর্ণা পুজো ও যজ্ঞ উপলক্ষে প্রণামী ও অন্নপূর্ণা মায়ের বস্ত্র দিয়ে ফিরে এসে গেলাম কাশী ৺বিশ্বনাথের এক নম্বর গলিতে। গলিতে ঢুকেই বাঁ হাতে কুঞ্জ সাউয়ের পেঁড়ার দোকান। তার উল্টোদিকের গলি এঁকে বেঁকে চলে গেছে মীড় ঘাটের দিকে। মীড় ঘাট পৌঁছোনোর একটু আগে ডান হাতে একান্ন শক্তিপীঠ এর এক পীঠ কাশী পীঠাধীশ্বরী দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দেবীর মুখমণ্ডল এখানে পতিত হয়ে ছিল। তাই এই তীর্থের নাম গৌরীমুখতীর্থ। দেবীর আদি মূর্তি বর্তমান বিগ্রহের পশ্চাতে ছোট্ট কুলুঙ্গিতে বিরাজমান। কথিত আছে ইনি স্বয়ম্ভু। কিন্তু কালের প্রভাবে দেবীর নাক মুখ চোখ বিলুপ্ত। প্রায় সমতল আকার ধারণ করেছে।

সামনের বর্তমান বিগ্রহ স্থাপনা করেন ১৯৭১ সালে দক্ষিণ ভারতের শ্রীঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য।

মন্দির দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে গড়া এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ শুরু হয় ১৮৮৫ সালে এবং শেষ হয় ১৯০৮ সালে। পুরোহিত কে অনুরোধ করলে বর্তমান বিগ্রহের পশ্চাতের আদি বিগ্রহ দেখিয়ে দিলেন।

বর্তমান বিগ্রহ কালো পাথরের দক্ষিণভারতীয় শৈলীতে গড়া। মায়ের মূর্তি বস্ত্রাচ্ছাদিত। এবং সবার মালায় ঢাকা।

নবরাত্রি চলছে। অনেকে পুজোর ডালায় বস্ত্র, সিন্দুর, আলতা ও টিপের পাতা দিয়ে পুজো দিচ্ছে।

মন্দিরে দেবী বিশালাক্ষীর অচল বিগ্রহ থাকলেও, আছেন আর এক সচল বা চলমান দেবী বিশালাক্ষী কুঠুরির মধ্যে। যাঁকে বছরে এক দিনই বার করা হয়। দশেরার দিনে তাঁকে শোভাযাত্রা করে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। এছাড়াও আছেন নবগ্রহের মূর্তি। ছোট ছোট অনেকগুলো শিবলিঙ্গ। তার মধ্যে একজন চণ্ডেশ্বর মহাদেব। এছাড়া আছে ব্রহ্মার মূর্তি। ভারতে ব্রহ্মার মূর্তি খুব বেশী জায়গায় নেই। পুষ্করে আছেন। আর এখানে।

একান্ন শক্তিপীঠের দেবী থাকলেই থাকবেন তাঁর ভৈরব। এখানে ভৈরব বিশালাক্ষীশ্বর মহাদেব।

কাশীর মন্দিরে মন্দিরে তো প্রবেশ করলাম। কিন্তু কাশীর অন্তরাত্মায় অনুপ্রবেশ করতে পারলাম কই? চর্মচক্ষেই কাশী দেখে ফিরে যেতে হবে। মর্মচক্ষে কাশী দেখতে হলে কাশীবাসী হতে হবে না হলে বাড়ি ফিরে সংসারের দাসত্ব করতে করতে সার হারিয়ে সংকে আঁকড়ে ধরে কাশীর সব দেখা মর্মে বাসী হয়ে যাবে। দেবী বিশালাক্ষীর মন্দির থেকে ফিরে এলাম বিশ্বনাথের গলিতে দাশগুপ্তের জর্দার দোকানে। আজ যতবছর কাশীতে আসছি দাশগুপ্তবাবুর চেহারা একই রকম আছে। আসার উদ্দ্যেশ্য কিছু পান মশলা কেনা আর কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে আসা লাড্ডু গোপালের জন্য কিছু আতর কেনা।

আজ এত বছরেও দোকান একই রকম আছে। দোকানের পিছনের ছোট ঘরে অনেকগুলো ছোট ছোট শিবলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। দাশগুপ্তের পূর্বপুরুষের স্থাপনা করা। এখনও প্রত্যহ পুজারী এসে পুজো করে দিয়ে যায় কথা হচ্ছিল দাশগুপ্তবাবুর সঙ্গে। কথায় কথায় উঠল সত্যজিৎ রায়ের "জয় বাবা ফেলুনাথ" এর ফেলুদার উক্তি—"কাশী বাঙালির সেকেণ্ড হোম লালমোহনবাবু। কাশীতে কত বাঙালি আছেন জানেন? দেড় লক্ষ।"

বাঙালিদের নাম অনুসারে কাশীর একটা জায়গায় নামই বাঙালিটোলা। কত বিদগ্ধ বাঙালি পণ্ডিত এক সময় কাশীতে থাকতেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাংলা বলে চলেছেন। কতজন জানে এক সময় মা বাবার দেখাশুনা করবার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কাশীতে বসবাস করতেন। কাশী তো শুধু অচল বিশ্বনাথের নয়, কাশী সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীরও। একদিন প্রস্রাব করে ছিটিয়ে দিলেন ৺কালীর গায়। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন স্তম্ভিত। তাঁদের জন্য মাটিতে লিখে দিলেন— "গঙ্গোদকং"। কিন্তু ৺কালীর গায়ে ছিটানো কেন?

লিখলেন "পূজা"।

কাশী মহাত্মা কবীরের। কাশী স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর। কাশী ডঃ গোপীনাথ কবিরাজেরও। উজ্জয়িনীর মহাকাল দ্বারা আদিষ্ট হয়ে কবি কালিদাস কাশীতে এসে আচার্যের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

আর অদ্বৈত পন্থী শঙ্করাচার্য তো কাশীতে এসে মা অন্নপূর্ণার লীলার সাক্ষাত পেয়ে শক্তিকে মানতে ও আরাধনা করতে শেখেন। আর কাশী বিসমিল্লা খানের। ১৯১৬ সালে বিহারের বক্সার জেলার দুমরাঁও গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। বাবা পয়গম্বর বক্স খান। মায়ের নাম মিঠান। ছ বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন মামার কাছে বারানসীতে। তাঁর মামা আলি বক্সই তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু। মামার কাছে সানাইতে তাঁর তালিম।

মামা সানাই বাজাতেন কাশীর বালাজী মন্দিরে এবং কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে। মামা তাঁকে সুযোগ করে দেন তাঁর সঙ্গে বাজাতে। মৃত্যুদিন পর্যন্ত গঙ্গায় স্নান করে তিনি কাশী-বিশ্বনাথ দ্বারের কাছে নহবতে সানাই বাজাতেন। মুশলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘরে ছিল মা সরস্বতীর ছবি তিনি বলতেন "বনারস" যাঁহা রস বনতা হ্যায়।

দাশগুপ্তবাবুর কাছে জানতে পারলাম তাঁর বসতবাটী ভেঙে তৈরী হচ্ছে আধুনিক মল। তাঁর নাতি বিসমিল্লার চারটে রূপোর সানাই বিক্রি করে দেয়। উত্তরপ্রদেশ পুলিস কেবলমাত্র একটি উদ্ধার করতে পেরেছে। বাকী তিনটে গলিয়ে রূপো বার করে নেওয়া হয়েছে।

কাশী আসা যদি আমার লক্ষ হয়, তবে উপলক্ষ তো একটা চাই। সেই উপলক্ষ হল অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষে আশ্রমে যজ্ঞ দেখা এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দেখা।

যজ্ঞ তো আসলে যোগ। সেই পরমপুরুষ এবং পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ ক্ষীরসাগর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে মিষ্টি আর মালার দোকান থেকে মালা কিনে আশ্রমে পৌঁছলাম সাড়ে দশটা নাগাদ। যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারী মন্ত্র বলে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন। রয়েছেন দেওঘর থেকে আসা ও স্থানীয় ঋত্বিকেরা।

যজ্ঞের বিরতিতে বড় গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী ও গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ

ব্রহ্মচারীজির মূর্তির অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন বৈদিক মন্ত্রের সাথে। তারপর পুজো। অন্নপূর্ণা পূজার দিন অন্নপূর্ণা মায়ের অভিষেক ও পূজা হল। পূজা ও অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন শ্রীশ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারীজি।

বেলায় বাইরের প্রাঙ্গনে সাধুভাণ্ডারা হবার পর ভক্তরা (আমরা) ভাণ্ডারা গ্রহণ করলাম।

যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেখতে দেখতে, ধোঁয়ার ঘ্রাণ নিতে নিতে এবং বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ শুনতে শুনতে মনটা এক ঝটকায় চব্বিশ বছর পিছিয়ে গেল। ১৯৯৯ সালের ২৬শে মার্চ। আগের দিন গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজী যজ্ঞস্থলে বসে আহুতি দিচ্ছিলেন। চারপাশে ঘিরে আমাদের ব্রহ্মচারী গুরুভ্রাতারা মহারাজের বামপার্শ্বে শ্রীশ্রীবিশ্বাত্মানন্দজী ও শ্রীশ্রীচিন্ময়ানন্দজী এবং মহারাজজীর ডান পাশে শ্রীশ্রীবিভবানন্দজী ও শ্রীশ্রীদর্শনানন্দজী মহারাজের ডানপাশে একটু সামনে সুরেশ ভাই। সুরেশ ভাই দুর্গাপুর আশ্রম থেকে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পরণে গাঢ় নীল রঙের বেনারসী বস্ত্র। গলায় লাল বেনারসী উত্তরীয়। আগুনের তাপে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের দেবতনুর ফর্সা মুখটি টকটকে লাল হয়ে গেছে। আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে দিতে মাঝে মাঝে কোলের ওপর রাখা তোয়ালে দিয়ে বাম হাতে মুখটি মুছে নিচ্ছেন। চৈত্রমাসের প্রচণ্ডগরম। যজ্ঞের বিরতিতে দুপুরে ঘরে প্রণাম দিলেন গুরুমহারাজজী। এক পাশে দাঁড়িয়ে সিতেন্দু মেসোমশাই। অপর পাশে রমামাসী। প্রণাম করার পর হাত দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে আবার পরিয়ে দিলেন কপালে বিভূতির টিপ দিয়ে শান্তির জল দিলেন। ফাঁকে ফাঁকে ভক্তের দেওয়া চিঠি পড়ছেন।

প্রণাম হয়ে গেলে ভাণ্ডারা খেয়ে আমরা ফিরে এলাম। আমরা সেবারে আশ্রম থেকে কিছুটা দূরে সোনারপুরার কাছে "ওম্ বিশ্বনাথ লজ" বলে একটা GUEST HOUSE এ উঠেছিলাম।

পরদিন আমরা বেলা প্রায় দশটা নাগাদ আশ্রমে গেছি যজ্ঞ দেখতে। গিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। আশ্রমের সামনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর গাড়ী তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে। শুনলাম শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর নাকি শরীর খারাপ। তাই চলে যাচ্ছেন। পূর্ণাহুতি অন্য কেউ করবেন।

কেউ Detail কিছু বলতে পারছে না কি ব্যাপার?

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ আশ্রম থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ীর কাঁচ তোলা। চারিদিকে ভক্ত শিষ্যদের ভীড়। তারা শ্রীশ্রীগুরমহারাজজীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। কিন্তু হৃদয় ভারাক্রান্ত গাড়ী start দিল। গাড়ীর কাঁচ তোলা।

এক ভক্ত তার কোলের বাচ্ছাটাকে নিয়ে গুরুমহারাজজীর দিকে জানালাটায় টোকা দিয়ে বলে উঠল "বাবা বাবা"। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী গাড়ীর কাঁচটা নামালেন। হাতটি অভয় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তোলা। ধীরে ধীরে আশ্রম ছেড়ে গাড়ীটা বের হয়ে গেল। পিছন পিছন অক্রূরের রথে চেপে শেষ বারের মত বৃন্দাবন ছেড়ে যাওয়া কৃষ্ণের পিছনে ধাবমান গোপ গোপীনিদের মত ভক্ত শিষ্যেরা। আমরাও গলির মোড় পর্যন্ত গেলাম—

"দাও মোরে বিদায় চ'লে আমি যাই,
মোহনমুরলী ঐ ডাকিছে আমায়।
বিদায় বিদায়, এবে লইনু বিদায়,
এ জনমে এই শেষ তোমার আমায়।।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২৫ সাল	১৪৩২ সন	উপলক্ষ্য
১৫ই এপ্রিল	১লা বৈশাখ মঙ্গলবার	বাংলা নববর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতার জামির লেনস্থিত শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ।
২৭শে মে	১২ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার	দেওঘর ও সকল আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
২৭শে জুন	১২ই আষাঢ়, শুক্রবার	দেওঘর আশ্রমে ও কলিকাতাস্থিত জামির লেন আশ্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠান পালিত হইবে।
৫ই জুলাই	২০শে আষাঢ়, শনিবার	শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা (উল্টোরথ) অনুষ্ঠিত হইবে।
১০ই জুলাই	২৫শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমসহ সকল তীর্থাশ্রমে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা। কলিকাতাস্থিত জামিরলেন আশ্রমে গুরুপূর্ণিমা উৎসব পালিত হইবে।
১১ই আগস্ট	২৫শে শ্রাবণ, সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং তপোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীনর্মদামাতার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারা। জামিরলেন সহ অন্য সকল তীর্থাশ্রমেও শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর তিরোধান উৎসব পালিত হইবে।
৫ই সেপ্টেম্বর-৭ই সেপ্টেম্বর	১৯শে ভাদ্র-২১শে ভাদ্র, শুক্রবার-রবিবার	হরিদ্বার আশ্রমে শ্রীশ্রীপরম গুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিন দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা। ৭ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র পূর্ণিমা, শ্রীশ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি ও প্রদোষে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা।
২২শে সেপ্টেম্বর	৫ই আশ্বিন, সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ ঘটস্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ।
২৭শে সেপ্টেম্বর	১০ই আশ্বিন, শনিবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লা পঞ্চমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন।

২০২৫ সাল	১৪৩২ সন	উপলক্ষ্য
২৮শে সেপ্টেম্বর	১১ই আশ্বিন, রবিবার	মহাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ অধিবাস।
২৯শে সেপ্টেম্বর	১২ই আশ্বিন, সোমবার	শ্রীশ্রীদুর্গামহাসপ্তমী। পূর্বাহ্ন মধ্যে দ্ব্যাত্মক চর লগ্নে ও চরণ বংশে। (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৭।০ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।২৯ গতে পূর্বাহ্ন মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।
৩০ সেপ্টেম্বর	১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা প্রশস্তা। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। **সন্ধিপূজা:** দিবা: ১/২১ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। দিবা: ১/৪৫ গতে বলিদান। দিবা: ২/৯ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।
১লা অক্টোবর	১৪ই আশ্বিন, বুধবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। শ্রীশ্রী৺চণ্ডীযজ্ঞ এবং পূর্ণাহুতি সহিত দেবীর নবরাত্রিক ব্রত সমাপ্ত।
২রা অক্টোবর	১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	দশমী। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমী কৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
৬ই অক্টোবর	২৯শে আশ্বিন, সোমবার	শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা দেওঘর আশ্রমে ও পুরীতীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৮ গতে ও রাত্রি ৬।৫৪ মধ্যে।

পুণ্য-পরশ-পুলক (১৮শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

আমাদের এখানে কালিপুজোতে সারাদিন ধরে একটা গানই শুনতে পাই। গানটা সাধক কমলাকান্তের 'শ্যামা মা কী আমার কালো রে...'। এত বেশি বার গানটা বাজতে থাকে যে গান শোনার আর কোনও আগ্রহ থাকে না। কানও কেমন যেন অভ্যস্ত হয়ে উপেক্ষা করে। গান গানের মতো বেজে যায়, আমরাও আমাদের মতো নিত্যকর্ম সমাধা করে চলি। কিন্তু এবারে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড হল যে কী বলব। কী একটা বই পড়ছিলাম। সেই সময় হঠাৎ গানের একটা পংক্তি কানে এলো, 'মা, কখনও প্রকৃতি কখন পুরুষ কখন শূন্যাকার হে...'। শোনামাত্রই কেমন যেন আকস্মিক ভাবেই মনটা থমকে গেল। হাতের বই মুড়ে রেখে ভাবতে বসলাম; মা কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি; মানে মা কখনও পুরুষ রূপে, কখনও স্ত্রী রূপে বিরাজ করেন। কখনও তিনি শূন্যাকার মানে অবাঙ্‌মনসগোচর অবস্থায় থাকেন। সে তো হতেই পারে। তিনি তো ব্রহ্মময়ী জননী। কিন্তু তবু ভাবনা গেল না। পংক্তিটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখি গুরুমহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি বরাবরই দেখেছি, এই এক জায়গায় এসে আমার সব প্রশ্নের উত্তর, সব গানের মানে পরিস্কার হয়ে যায়। গুরুমহারাজের সে হাসি মুখ দেখে মনে হল যেন তিনি রহস্য করছেন। নিজেকে চেনাচ্ছেন।

স্মৃতিপটে আর একটা ছবি ভেসে এলো। দেওঘরে তিনি দুর্গাপুজো করছেন। আমার স্মৃতিতে তাঁর ওই দুর্গা আরাধনা আর জগদ্ধাত্রী পুজোর ছবি আছে। কেন না, কেবলমাত্র দেওঘরে আর সাঁইথিয়াতেই আমি গেছি। আর হ্যাঁ, কলকাতায় সরস্বতী পুজো করতে দেখেছি। সে কথা মনে আছে। সরস্বতী পুজোর অঞ্জলির কথা এখনও মনে পড়লে হাসি পায়। কেন না, আমরা তো দু মিনিটে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভ্যস্ত। সেই মতো হাতে ফুল বেলপাতা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি। গুরুমহারাজ মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন। সংকল্প, ধ্যান, অর্গলা স্তোত্র, নারায়ণী স্তুতি, প্রার্থনা সহ পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র পড়াচ্ছেন। আমি তো অনেকক্ষণ থেকে ভেবেই চলেছি; এই, এবার বুঝি শেষ হল, এইবার বুঝি শেষ হল কিন্তু না, শেষ তো হচ্ছে না, মন্ত্রের পর মন্ত্র চলছে। তারপর যখন শেষ হল তখন প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে।

বোধহয় দুবার কী তিনবার গুরুমহারাজের কাছে সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দেবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। আর সাঁইথিয়াতে আর একটা কাণ্ড বেশ মজা লেগেছিল। জগদ্ধাত্রী পুজোর অঞ্জলির শেষে একজন ভক্ত একটা ঝুড়িতে সকলের হাত থেকে ফুল বেলপাতাদি সংগ্রহ করে তার কিছুটা দেবীর শ্রীচরণে নিবেদনের পর অবশিষ্ট ফুলবেলপাতা ইত্যাদি সব গুরুমহারাজের চরণে ঢেলে দিলেন। গুরুমহারাজ কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে সেই ফুলগুলি ঠেলে দিলেন পূজাবেদীর দিকে।

যাক, যে কথা বলছিলাম, তাঁকে যখনই বড়ো কোনও পুজো করতে দেখেছি, সে দুর্গাপুজো, কালী পুজো, লক্ষ্মী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এমনকি যজ্ঞাদির সময়েও তাঁর বেশবাস 'একেবারে স্ত্রীলোকের মতো। মাথার মুকুট থেকে পায়ে নূপুর পর্যন্ত মেয়েদের মতোই গহনা আর বেনারসি শাড়িতে থাকতো

তাঁর শ্রীতনুদেহ আবৃত। তাঁর স্নেহময়তাও মাতৃময়ী। অন্যদিকে তিনি পুরুষের মতোই বীর্যদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। আর এই দুই ছাড়িয়ে যখন তিনি আত্মমগ্ন, তখন সেই অতলে নামার স্পর্দ্ধা বা ক্ষমতা কারো নেই; এমনকি সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকা কাছের মানুষগুলোও ওই সময় স্তব্ধ হয়েই থাকতেন। তখন তাঁর অবাঙ্মনসগোচর অবস্থা। হয়তো তখন তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞানই থাকে না। কীর্তনের আসরে অনেক সময় দেখেছি, কীর্তন করতে করতে তিনি মৌন হয়ে যেতেন। অজিত দা, ভীষ্ম দা, ছোটমাসী (কস্তুরী), দীপ্তি দি বা অন্য যাঁরা থাকতেন তাঁরা কীর্তন চালিয়ে যেতেন। তা হলে কী গুরুমহারাজের মধ্যে সেই পরমতত্ত্বই আশ্রয় নিয়েছিলেন! এই বিস্ময়কর প্রশ্ন মনে জাগার পরে যখন আকাশ পাতাল চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে চলেছি, এমন সময় আবার শুনলাম গানটার মধ্যে বাজছে; 'মা, কখনও শ্বেত কখনো পীত কখনো নীল লোহিত রে.....।' তার মানে দেবী মা বর্ণচোরা! এক এক সময় এক এক বর্ণকে অঙ্গে আশ্রয় দেন?

'বর্ণচোরা' শব্দটা হঠাৎ মনে একটা পুরোনো স্মৃতিকে উস্কে দিল। আসলে সত্যি কথাই বলি, মহারাজকে অন্য কারো সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করার ব্যাপারে আমার ঔদার্যের যথেষ্ট অভাব আছে। এই ব্যাপারে আমি নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক। এমনকি গুরুমহারাজের ছবি, সি.ডিও কাউকে দিতে আমার মন সরে না। গুরুমহারাজের কাছে কাউকে নিয়ে যেতেও আমি রাজি নই। কেমন যেন মনে হত, তিনি আমার, কেবল আমার, আর কারো সঙ্গে তাঁকে ভাগ করে নিতে পারব না।

কিন্তু আমার দাদা একেবারে বিপরীত স্বভাবের। নিজের চেনা জানা বন্ধু বান্ধবদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন গুরুমহারাজকে প্রণাম করতে। সেবারও এক বন্ধুকে নিয়ে চললেন গুরুমহারাজের দর্শনে। আমার তো সারাদিন অস্বস্তিতেই কাটলো। কী জানি কী মন্তব্য করবে! আমাদের মহারাজ ; আমাদের মহারাজ, অন্যলোকে কী তাঁকে বুঝবে! না জানি তাঁরা কী মন্তব্য করবে। এ সব শুনতে কারই বা ভালো লাগে? যাই হোক, গুরুমহারাজকে দর্শন প্রণাম করার পর যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

পরদিন সেই বন্ধু যখন আমাদের বাড়িতে এলেন, তখন মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল কেমন দেখলে?' তিনি উত্তরে যা বললেন, তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললেন, 'উনি তো বর্ণচোরা।'

—মানে?

—হ্যাঁ। বর্ণচোরাই তো দেখলাম। এই দেখছি লাল, এই দেখছি নীল, এই দেখছি সবুজ, এই সাদা। ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করে দেখেছি। একবার ভাবলাম আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধাচ্ছে। কিন্তু না, খুব ভাল ভাবে লক্ষ করে দেখলাম বারে বারে রঙ পাল্টাচ্ছে তাঁর মুখের।' মা বললেন, 'হতে পারে বাবা, তিনি যখন যে ভাবে থাকেন, হয়তো তখন সেই রঙের আভা তাঁর শ্রীমুখে ফুটে ওঠে। মানুষের যুক্তি বুদ্ধিতে তো ওনাদের ধরা যায় না।'

সত্যি বলছি, গুরুমহারাজের এই বর্ণচোরা রূপ আমার কাছে কখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নি। কিন্তু একজন মানুষকে তিনি যে রূপ দর্শন করিয়েছেন, তাঁর প্রতি সেই রকম কৃপা করেছিলেন বলেই না আমাদের সেই বন্ধু ওই রূপে তাঁকে দর্শন করতে পেরেছিলেন।

আজকে সেই স্মৃতি আমাকে একটা গানের অর্থ পরিস্কার করে দিল; 'মা কখনও শ্বেত, কখনও পীত, কখনও নীলাকার রে....' কখনও তিনি জ্ঞানময়ী সরস্বতী, কখনও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কখনও ব্রহ্মবিৎ... ব্রহ্মময়ী। শুনতে শুনতে পচে যাওয়া গানটাকে আবার যেন নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করলাম।

(ক্রমশঃ)

"শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র'র লিখিত
স্মৃতির আলোকে বিগতদিন" থেকে কিছুটা অংশ বিশেষ

এবারে প্রথমে লিখব বালানন্দজীর শ্রীশ্রীশক্তি বা ইচ্ছা শক্তির কথা। তিনি ছিলেন অসামান্য মহাপুরুষ। সারা ভারতে তাঁর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাঁর নামে আমি সর্ব জায়গায় বিশেষ করে এই পথের পথিক যাঁরা তাঁদের নতশির হতে দেখেছি। আমি তাঁর কাছে এসেছিলাম বাল্য বয়সে। তাঁর ঐশী শক্তি বা ইচ্ছা শক্তির কথা বোঝার বা অনুভবের বয়স বা বুদ্ধি আমার ছিল না। উপরোক্ত দুই জনের রচিত বালানন্দজীর জীবনী পুস্তকে বহু ঘটনার কথা লিখিত আছে। সেগুলি ব্যতীত তখনকার বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মুখে বেশ কিছু ঘটনার কথা শুনেছিলাম। আমি নিজে তাঁর অপ্রকট হবার পরেও আশ্রমে আমার পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর করুণা অনুভব করেছিলাম। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে আকুল ক্রন্দনে মহাপুরুষদের সাড়া আজও পাওয়া যায়। তার কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করে লিখে রেখে যাব। আজ বয়সের ভারে অনেক ঘটনা স্মৃতিতে আবছা হয়ে এসেছে। হয়ত অনেক ঘটনার সাল তারিখ ভুল হতে পারে। তবে আমি যে ঘটনাগুলির বিবরণ ঘটনা লিখে রেখে গেলাম বা এরপর লিখব সেগুলি কিন্তু আমার মনের পাতায় অভ্রান্তভাবে আঁকা আছে। প্রত্যেকটি ঘটনা অভ্রান্ত সত্য। এ সব ঘটনার ব্যাখ্যা আমি সারাজীবন খুঁজে পাইনি।

বালানন্দজীর যে সব ঘটনা কোথাও প্রকাশিত হয়নি, আমি বয়োঃজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছি সেগুলিই প্রথমে লিখতে আরম্ভ করলাম—

সেই তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশকে যে সব বয়োঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা মহিলারা আশ্রমের আশে পাশে বাস করতেন সম্পূর্ণ আশ্রমের ভরসায়, তাঁরা স্মৃতির পারে আসছেন, কেমন করে ভুলব তাঁদের ব্যবহার ও স্নেহধারার কথা? গঙ্গাশ্রমের দিদিমাকে আমার নিজের দিদিমা বলে জ্ঞান করতাম।

আশ্রমে আজ যেখানে স্থিত শ্রীশ্রীবালেশ্বরী ভবন, সেখানে যে গৃহ ছিল তার নাম ছিল গঙ্গাশ্রম! সেই গৃহে বাস করতেন প্রাণগোপাল বাবুর পরিবারবর্গ। সে সময় এই "গঙ্গাশ্রম" নামটি যে কি অসম্ভব শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত আজ কেউ ধারণাই করতে পারবেন না। সে গৃহের প্রত্যেককে আজ স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। ভুলব না সেই পরিবারের কোন জনকে। পরিবারের পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী সকলকেই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তপমামা, গৌরমামা, গোবিনমামাকে। আমার বাল্যকালে প্রথম যখন তাঁদের গৃহে গিয়েছিলাম, তখন আমার মা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন দিদিমাকে প্রণাম করতে। আমার পিতৃদেব শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন আশ্রমে, অন্নপূর্ণা আশ্রমে। তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। সে সময়ে তপমামা ও দিদিমার সাহায্য চিরদিন মনে থাকবে। আমার ভগিনীর অসুস্থতার সময় তাঁদের উৎকণ্ঠার কথা কি কখনও ভুলতে পারি? তাঁদের প্রত্যেককে আমার প্রণাম জানালাম।

চিনেছিলাম নির্মলা মাসীমাকে, সরলা মাসীমাকে, মণীন্দ্র আশ্রমের উমা মাসীমাকে। আলাপ হয়েছিল

আরও কত জনের সঙ্গে, যাঁরা বালানন্দজীর বহু পুরাতন শিষ্য-শিষ্যা। মহারাজজীর সৎ প্রসঙ্গ যেমন আশাদি (পুরী) সব লিখে রেখে গেছেন সরলা মাসীমা তেমনি তাঁর গুরুদেব বালানন্দজীর সৎপ্রসঙ্গগুলি ''কথা-প্রসঙ্গ'' নাম দিয়ে সংকলিত করে গেছেন। আজ অবাক হয়ে ভাবি সে যুগে একজন মহিলা একবার শ্রবণ মাত্রেই কি করে এই সব দুরূহ আলোচনার কথাগুলি মনে গেঁথে নিয়েছিলেন এবং রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন? এটি কোন শক্তি বা কে তাঁকে এই শক্তি দিয়েছিলেন? আশাদি (পুরী) ও সরলা মাসীমা চিরকাল স্মরণে থাকবেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁদের এই মহৎ কর্মের জন্য।

নির্মলা মাসীমাকে কি ভুলতে পারব? তিনি ছিলেন তখনকার প্রখ্যাত হাটখোলার দত্ত বাড়ীর কন্যা। তাঁর একান্ত দুর্ভাগ্য যে অতি অল্পবয়সেই তিনি স্বামীহারা হয়েছিলেন এবং তাঁর সৌভাগ্যে বালানন্দজীর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর একান্ত আপনজন জ্ঞানে স্নেহ করতেন। অকুণ্ঠ ভালোবাসা পেয়েছি তাঁর কাছে। দিনের পর দিন তাঁর ঘরে বসে শুনেছি মহারাজজীর প্রথম আশ্রমে আসার গল্প, বালানন্দজীর আশ্রম পরিচালনার কথা, তাঁর ঐশী শক্তি বা ইচ্ছা শক্তি প্রকাশের কত ঘটনার কথা। সে সময় আশ্রমে মহারাজজী কি রকম ভাবে দিন কাটাতেন, তাঁর গুরুদেবকে কি নিষ্ঠাভরে সেবা করতেন, সেই সব কাহিনী। সে সব কথা হয়তো এর আগেই শুনেছিলাম গঙ্গাশ্রমের দিদিমার কাছে বা অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ বা বয়োঃজ্যেষ্ঠাদের মুখে। কিন্তু আজ ভাবতে অবাক লাগে যে সেই বার বার শোনা কাহিনী কিন্তু যখনি শুনতাম, ভালই লাগত। সেই একই আগ্রহ থাকত মনে। মনে আছে দিনের পর দিন নির্মলা মাসীমার ঘরে বসে শুনেছিলাম এই সব কথা। সে সময় হয়ত তিনি তাঁর আহার্য প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু তবুও তাঁর এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে কখন বিরক্তি দেখি নি বা সেই অসময়ে তাঁকে বিরক্ত করলেও হাসিমুখে আমার কৌতূহল নিবারণ করতেন। হয়ত সেই সব কথা রোমন্থন করতে তাঁর ভালই লাগত, যেমন আজ এই সব ঘটনার কথা লিখতে লিখতে সেই সব দিনে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মন পাচ্ছে অসম্ভব তৃপ্তি আনন্দ। তিনিও হয়ত সেইসব পুর্বদিনের কথা রোমন্থন করে এইরূপ আনন্দ তৃপ্তি পেতেন সেইসময়।

এই সব অনেক দিন আগের কথা। বহুদিন হল তিনি চিরতরে চলে গেছেন কিন্তু আজও তাঁকে স্মরণ করলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে। আমি তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম দেওঘরেই আমার বাল্য বয়সে। যেবার মহারাজজীর কৃপা ও আশীর্বাদে আমার সেই দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া জ্বর পালিয়েছিল, যতদূর মনে পড়ছে সেই বারেই তিনি বালানন্দজীর একটা ঐশী শক্তি প্রকাশের ঘটনা জানিয়েছিলেন, যা সম্ভব করেছিল তাঁর একটা গলগণ্ড সারিয়ে তুলতে। সেই সব ঘটনার বিবরণ জানাতে জানাতে তাঁর চক্ষু অশ্রুজলে ভরে উঠেছিল দেখেছিলাম।

নির্মলা মাসীমা তাঁর গুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের পর এক সময় তাঁর গলায় একটা গলগণ্ড দেখা দিয়েছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। যথারীতি তখনকার দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, সার্জেন তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের সকলের অভিমত ছিল যে একমাত্র অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই। সেই ভাবেই নির্মলা মাসীমার অভিভাবকরা প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেছিলেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব অপারেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

সেই সময় মাসীমা তাঁর আত্মীয় স্বজনকে অনুরোধ করেছিলেন যে অপারেশনের আগে একবার দেওঘরে তাঁর শ্রীগুরুচরণে তাঁকে প্রণাম করিয়ে আনতে। অপারেশনে কি হবে বা না হবে সবই অনিশ্চিত। সেই জন্য তাঁর গুরুদর্শন ও তাঁকে প্রণাম করে আসায় তাঁরা বাধা দেননি। তাঁরা তাঁকে দেওঘরে তাঁর গুরুদেব বালানন্দজীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সব কথা জানিয়ে অপারেশনের অনুমতি চেয়েছিলেন। বালানন্দজী সব কথা শুনে তাঁর সেই গলগণ্ডটি নিজে পরীক্ষা করেছিলেন। নির্মলা মাসীমাকে দেওঘরে কিছুদিন রাখার জন্য ও একটি সময় ঠিক করে প্রতিদিন তাঁর কাছে সেই নির্দিষ্ট সময়ে মাসীমাকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

মাসীমার আত্মীয় স্বজনেরা সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যহ বড় মহারাজজীর নির্দিষ্ট করা সময়ে মাসীমাকে ধ্যান কুটিরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। বালানন্দজী তাঁর "বিভূতি মরিচ" রোজ ঘসে চন্দনের মত মাসীমার গলগণ্ডে প্রলেপ দিয়ে দিতেন নিজের হাতে।

এই ভাবে প্রায় এক মাস কাটার পর দেখা গিয়েছিল মাসীমার সেই গলগণ্ড, যেটা অপারেশন ভিন্ন গতি নেই বলে ডাক্তারেরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, সেই গলগণ্ড একেবারে ছোট হয়ে মার্বেলের মত আকার ধারণ করেছিল।

মাসীমা এই কাহিনী বর্ণনার সময়ে তাঁর গলায় যে জায়গায় গলগণ্ডটি হয়েছিল, সেই স্থানটি আমায় দেখিয়েছিলেন। আমি সেই জায়গাটাতে একটু ফোলা দেখেছিলাম এবং সেই রকম ফোলা ভাব তাঁর আমৃত্যু ছিল। সেই গলগণ্ড এইরূপ ছোট আকার ধারণের পর বালানন্দজী মাসীমার আত্মীয়বর্গকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের অভিমত জানতে আদেশ দিয়েছিলেন। মাসীমা আত্মীয়বর্গের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেই সব বড় বড় ডাক্তার ও সার্জেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁরা তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে গলগণ্ড কোথায় গেল? তাঁরা তাঁদের চিকিৎসা বিদ্যার মধ্যে এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। তবে সে সময়ের সকল স্তরের মানুষের মনে সাধু মহাত্মাদের ঐশী শক্তির উপর একটা বিশ্বাস ছিল। মাসীমা আমায় বলেছিলেন যে সেদিনের সেই ডাক্তারবাবু তাঁর গুরুদেবের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। যে কোন শক্ত অসুখ তাঁদের কাছে এলেই তাকে তাঁরা বলতেন—

"যদি বাঁচতে চাও তো সোজা দেওঘর চলে যাও। সেখানে বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের চরণে গিয়ে পড়।" মাসীমার আর অপারেশন করাতে হয়নি। সারা জীবন তাঁর গলার এই জায়গাটা মার্বেলের মত ফোলা থেকে গিয়েছিল। আজ লিখতে লিখতে তাঁর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেদিনের বর্তমান আজ অতীতের রূপ ধরেছে।

শ্রীশ্রীবালানন্দজীর সেই বিভূতি মরিচ নর্মদা মাঈ-এর দান। এর কথা আমি পূর্বেই লিখেছি। মহারাজজীর পিতৃদেবের লেখা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি সেখানে, যাঁর অসুস্থতা এই বিভূতি মরিচ সারিয়ে দিয়েছিল। আশ্রমে ধ্যান কুঠিরে আমি এই বিভূতি মরীচের পুঁটুলি দেখেছিলাম। আজকাল মহারাজজী আশ্রমে থাকেন না। আশ্রমে আজকাল অন্য অধ্যক্ষ স্থির করে দিয়েছেন। জানি না সেই বিভূতি মরিচের পুঁটুলি আজও আছে কিনা?

নির্মলা মাসীমা, ইত্যাদিরা তখন নির্ভয়ে সেখানে আশ্রমের আশেপাশে বাস করতেন সম্পূর্ণ আশ্রমের

উপর নির্ভর করে। আশ্রমে তখন মহারাজজী নিজেও বৎসরের বেশীর ভাগ সময় বাস করতেন। আশ্রম অর্থাৎ সে সময়ের আশ্রমের ব্রহ্মচারীবৃন্দ তাঁদের সুখ সুবিধা অসুবিধা সব কিছুই তদারক করতেন। আমার নিজের জীবনে এই তদারকী যে কত প্রাণবন্ত ছিল তা দেখার বা অনুভবের সৌভাগ্য হয়েছিল। এখনও অবশ্য আমাদের আশ্রমের ব্রহ্মচারী ভায়েরা সেই রকম ভাবেই আশ্রমের আশে পাশে বসবাসকারী ভক্ত শিষ্যদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেন, যেমন প্রয়োজন পড়ে।

আমার সমগ্র পরিবারবর্গ একবার ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রায় চার বৎসর কাল এক নাগাড়ে আশ্রমের পাশের গৃহ বিশুদ্ধ নিবাসে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ এই গৃহের স্থানে নির্মিত হয়েছে নূতন গৃহ "শ্রীশ্রীবালেশ্বর ভবন"।

সে সময় আমার পিতৃদেবকে নিজের কর্ম উপলক্ষে কলকাতায় থাকতে হত। আমি প্রথম কিছুদিন দেওঘরে অবস্থানের পর নূতন কর্মে যোগদানের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিলাম। কাজেই আমাদের গৃহে আমার মা একেলা আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে অবস্থান করতেন।

সে সময়ে বৎসরের সব সময়ই আশ্রমে মহারাজজীর বাস। মনে আছে মহারাজজী পাহারার জন্য রাত্রে আমাদের গৃহে দু'জন লোককে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা রোজ রাত্রে নয়টার সময় এসে আমাদের গৃহে যে বসবার ঘর ছিল সেখানে সারারাত শুয়ে থাকত এবং ভোরবেলা আশ্রমে ফিরে যেত। সুদীর্ঘ চার বৎসর কাল এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল।

সে সময়ে দেখেছিলাম আমার পিতৃদেবের অকুণ্ঠ ভরসা মহারাজজীর উপর, আশ্রমের উপর এবং তাঁর প্রয়াত গুরুদেবের উপর। ঐ বিশুদ্ধ নিবাসে একবার আমার ভগিনী "গীতা" কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সেই চল্লিশের দশকের প্রথমে এই রোগ যে কী ভীষণ ভয়াবহ ছিল তা আজ ধারণাই করা যায় না। এই রোগের কোন প্রতিষেধক সে সময় আবিষ্কৃত হয়নি।

আমার পিতৃদেবকে সে সময় দেখেছিলাম এই রোগীর ভার সম্পূর্ণভাবে মহারাজজীর উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার ভগিনীর আরোগ্য লাভের জন্য ঔষধ বা ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল বটে এবং মহারাজজীর নির্দেশ মত সে সময় আশ্রমের হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক সুরেন দত্ত ও কবিরাজী চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত যে আমার পিতার মহারাজজীর ও আশ্রমের উপর নির্ভরতা এনে দিয়েছিল তাঁদের আশীর্বাদ ও ভগিনীর নিরাময়তার জন্য তাঁদের ইচ্ছা। তার ফলে এসেছিল আমার ভগিনীর সুস্থতা। তাঁর অসুস্থতার সময়ে মহারাজজী প্রতিদিন সন্ধ্যায় "সন্তোষ আশ্রমে" তাঁর নিয়মিত পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি সমাপনান্তে স্বয়ং প্রত্যহ রোগীর ঘরে উপস্থিত থাকতেন, ভগিনীর সঙ্গে কথাবার্তায় তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন যাতে তার মন প্রফুল্ল থাকে। এই প্রসঙ্গে পরমানন্দজীও স্মরণে এসে যাচ্ছেন। তিনিও বার বার আমাদের গৃহে খবর নিতেন।

আমার ভগিনীর অসুস্থতার সময় বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলাম তখনকার আশ্রমের কর্মচারীদের কাছে ও আশে পাশে বসবাসকারী মহিলা ও পুরুষদের কাছে। গঙ্গাশ্রমের বাসিন্দাদের সাহায্যের কথা কখনও ভুলব না। তখন আশ্রমের ভক্ত শিষ্যদের তাঁরা আশ্রমের অঙ্গ বলে জ্ঞান করতেন।

পরবর্তী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়ঃ

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal
(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)

LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 01-10-2024 to 14-02-2025)

DATE	RT. NO.	NAME	AMOUNT (RS.)
01-10-2024	1704	A WELL WISHER, KOLKATA	1,001.00
22-10-2024	1703	AGNI KUMAR GHOSH & KRISHNA GHOSH KOLKATA	501.00
30-10-2024	1525	A WELL WISHER	1,080.00
01-11-2024 TO 01-02-2025		P & J CHANDRA FINANCIAL SERVICE PVT. LTD., KOLKATA	8,000.00
08-11-2024	1726	MANASI BANERJEE SHYAMPUR (DURGAPUR)	1,001.00
08-11-2024	1727	MEKHALA MUKHERJEE BIDHANNAGAR	10,000.00
08-11-2024	1728	AMIT DUTTA - ASANSOL	1,000.00
08-11-2024	1729	SYAMA PRASAD DAS - ASANSOL	1,000.00
12-11-2024		CADILA PHARMACEUTICALS LTD. AHMEDABAD	29,400.00
14-11-2024	1730	GOUTAM GORAI - SAHEB GANJ	21,000.00
14-11-2024	942	A WELL WISHER	1,000.00
21-11-2024	1706	A WELL WISHER - KOLKATA	1,002.00
05-12-2024	1731	SUSHIM MUNSHI - U.S.A.	10,000.00
10-12-2024	1707	AGNIKUMAR GHOSH - KOLKATA	600.00
10-12-2024	1708	ASHIS SENGUPTA- KOLKATA	500.00
10-12-2024	1709	SABITA BISWAS - KOLKATA	5,001.00
13-12-2024	943	A WELL WISHER	720.00
18-12-2024	1734	MAHUA BHATTACHARYA	30,001.00
18-12-2024	1733	MRIDULA BHATTACHARYA - KOLKATA	1,001.00
19-12-2024	1710	NANDINI MAJUMDER KOLKATA	1,000.00
19-12-2024	676	MEMORY OF LATE JISHNU GOPAL BANERJEE - KOLKATA	1,000.00
19-12-2024	677	MEMORY OF LATE SUCHITRA CHOWDHURY - KOLKATA	1,000.00

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

19-12-2024	678	KOUSHIK DUTTA - KOLKATA	500.00
27-12-2024	1735	AJIT BANERJEE, HYDERABAD	50,001.00
28-12-2024	1736	SYAMA PRASAD DAS - ASANSOL	3,000.00
01-01-2025	1679	PRANATI BHATTACHARYA - KOLKATA	5,000.00
01-01-2025	1680	DISCIPLES OF SALT LAKE KIRTAN SANGHA, KOLKATA	20,000.00
02-01-2025		SOMA MITRA	1,000.00
08-01-2025	1737	AMARTA SHANKAR CHOWDHURY - DURGAPUR	20,001.00
09-01-2025	1711	A WELL WISHER	1,002.00
10-01-2025	1679	PRANATI BHATTACHARYA - KOLKATA	5,000.00
17-01-2025	944	A WELL WISHER	500.00
20-01-2025		ARIJIT GHOSH	5000
28-01-2025		ARIJIT GHOSH	750.00
30-01-2025		ARUN KUMAR CHATTERJEE	8,000.00
31-01-2025	1738	ALLIANZ PHARMA DURGAPUR	15,000.00
31-01-2025	1739	CYTOCHROME LIFE SCIENCES	15,000.00
11-02-2025	1713	PRABIR KUMAR BASU	10,000.00
14-02-2025		SOMA MITRA	1,000.00

PLEASE SEND YOUR DONATION:-

For Donation in Indian Rupees:

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA, MUCHIPARA BRANCH, DURGAPUR-713212, BURDWAN, WEST BENGAL.**
ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE:SBIN0006888.

For Donation in Foreign Currency:

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, BRANCH CODE: 00691 ACCOUNT NO. 40283076692 SWIFT CODE: SBININBB104, IFS CODE: SBIN0000691**, Account Type: FCRA **(Savings).**

For Baleswari Patrika

Shree Shree Mohananda Samaj Seva Samity
SBI, SALTLAKE,
AE-MARKET BRANCH,
KOLKATA-64
A/c No. 10527195247– IFC CODE-SBIN0006794

কিছু স্মৃতিচারণ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

"আমি অকৃতি অধম বলেওতো কিছু
কম করে মোরে দাওনি..."

গানটি কান্তকবির লেখা, অনেকেই গেয়েছেন, তবে গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললতিত কণ্ঠে এটি শ্রবণ কালে এমন ভাববিহ্বলতা ঘটে তখন প্রচলিত কথাটিই বলতে হয়, "প্রাণের ভিতর দিযা মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।"

আনন্দময়ীমার পরম ভক্ত এবং শিষ্যা ছবিদি আমাদের গুরমহারাজজীর খুব অনুরক্ত ছিলেন। উনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে বদ্রীনারায়ণ গিয়েছিলেন, ওনার শরীরটা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না—মহারাজজী নিজে মন্ত্র বলিয়ে ওনাকে পুজো করিয়েছেন আর ওনার কণ্ঠ স্পর্শ করে বলেছেন, শরীর ভাল নয়তো কী হয়েছে, গলাতো ঠিক আছে— 'একটা গান করো।'

মা আনন্দময়ী মহারাজজীকে গোপাল বলতেন আর উনি ব্রহ্মলীন হওয়ার পর ওনার অনেক শিষ্য শিষ্যা গুরুমহারাজজীর কাছে যাতায়াত করতেন তাঁর স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার তলায় মন জুড়াবেন বলে।

গুরুমহারাজজীর অন্তিম সময়ে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে আমাদের কী করণীয়? অথচ সবার মনই ভীষণ ভারাক্রান্ত' আমেরিকা থেকে প্রতিদিনই যা খবর আসছে তাতে আমরা ক্রমশঃই আশাহত হচ্ছি।

গুরুমহারাজজীর অত্যন্ত পুরণো শিষ্য ভাগলপুরের ৺হরেন দাসের এক পুত্রবধূ ধীরাবৌদি ঐদেশে গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; তাঁর স্বামীর গুরুদেবকে দেওয়া একটা চিঠিতে প্রশ্ন ছিল, তিনি পার্থিব জগৎ ত্যাগ করলে আমাদের কী করণীয়' এই চিঠিটা প'ড়ে গুরুদেব সেই চিঠিরই খামের পিছনে লিখে দিয়েছিলেন, "হরর্ণামৈব, নামৈব, নামৈব কেবলম্"...।

আমরা তখন অষ্টম প্রহর নাম সংকীর্ত্তন করার কথা চিন্তা করলাম। এখন একটা বড় হল ঘরের প্রয়োজন। রাসবিহারী মোড়ের কাছে মা আনন্দময়ীর শিষ্যা ও গুরুমহারাজজীর পরমভক্ত ৺গোপা ঘোষ এগিয়ে এলেন। তাঁর বাড়ির বিশাল হলঘরটিতে আমরা শুরু করলাম অখণ্ড নাম সংকীর্তন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

'খাইতে শুতে যথাতথা নামলয়।
কাল-দেশ নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়।।'

যদিও আমাদের সম্প্রদায়ের সবারই শ্রীকণ্ঠে ধ্বনিত ও মনে সর্বদাই অনুরণিত হতে থাকে শ্রীগুরুদেবেরই

গাওয়া কীর্তনগুলি, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাই আমরা 'হরে কৃষ্ণ' নাম বিভিন্ন সুরের মাধ্যমে গাওয়াতে বড় একটা অভ্যস্ত ছিলাম না, তিনি বহুবার আমাদের শিখিয়েছেন গানের মাধ্যমে 'হরি বল মন, কেহ নয়

আপন এ সংসার শুধু নিশার স্বপন।
(তোর) আপন বলিতে এই অবনীতে
হরি বিনে আর নাহি অন্যজন।'

সে যাই হোক শুরুতো আমরা করলাম সংকল্প নিয়ে, আজও ভাবলে অবাক লাগে কত কত সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যরা যে এসে যোগ দিলেন এই অষ্টম প্রহর নাম-সংকীর্তনে; যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাই সেইসব জানেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরপর দুদিন এসে গেয়ে গেছেন। তখনই জানলাম তিনি নাম শুরু করার আগে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবেন না আর নামের শেষে স্পর্শ করা যেতে পারে তবে তখন তিনি মৌন থাকেন।

পরে ছবিদির কাছে এর কারণ জানতে চাইলে উনি বলেছিলেন শরীর ও মনের তখন ভিন্ন অবস্থা হয়। সেই সময় নাম রসে মন ডুবে থাকে, পারিপার্শ্বিক কোলাহলে তার রেশ টুকু যাতে উবে না যায় তার জন্যই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। ভেবে দেখলাম আমরা কীর্তনে যাই, শুনি, রস আস্বাদন করি কিন্তু শেষ হলেই এমন সব আলোচনা, হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে যায় যে যা হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম তার কতটুকুই বা অন্তরে সংরক্ষণ করে রাখতে পারি?

তারপর থেকেই ছবিদির সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায়, আমি যেন তাঁরই পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। শ্রদ্ধেয় গোকুলজী ওনার বাড়িতে গিয়ে কীর্তন করে আসেন। পরবর্তীকালে আমি ওনার ভাইপোর ছেলের ভিক্ষা মা হই ওনারই ইচ্ছায়।

ওনার সঙ্গে অনেক সৎসঙ্গও হত। বলতেন ধর্মের নামে অনাচার করলে জীবনে উন্নতি না হয়ে বরং দুর্গতিই হয়। কিন্তু গুরুর উপদেশাবলী মেনে চললে প্রারব্ধ কর্মের ফলে সুখ বা দুঃখ যখন যে প্রকার ভোগ এসে উপস্থিত হয় অনুদ্বিগ্ন চিত্তে তাই-ই সহ্য করতে হয়। ভোগ না করলে কর্মফল ক্ষয় হয় না। সে যাই হোক, তারপর থেকে আমরা গুরুদেবের ব্রহ্মলীন হওয়ার তিথি ধরে পর পর কয়েকবছর অষ্টম প্রহর নাম বজায় রাখি বেশ কয়েক বছর ধরে নিজেদেরই বাড়ির ছাদে প্যাণ্ডেল করে। সে এক অনাবিল আনন্দ খড়্গপুর থেকে বাদলদা আসতেন। ছবি দিতো আসতেনই আর উনিই কুঞ্জভঙ্গ করতেন। মহামিলন মঠ, রামঠাকুরের আশ্রম, মা আনন্দময়ী আশ্রম, কৈলাস, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সকল ভক্তরা আসতেন আর নামগানে অংশগ্রহণ করতেন। প্রত্যেকটা প্রহরের রাগ ধরে ধরে চলত নাম সংকীর্তন। চোখের সামনের উদিত রবির পুবের আকাশের রঙের খেলা দেখতে দেখতে সবাই বিভোর হয়ে যেতাম আমরা। ''গর্বে আমাদের বুক ভরে যেত মহারাজ'' বলতে।

তাঁর যে বিশ্বজোড়া ফাঁদ পাতা ছিল, তা আমরা উপলব্ধি করি। ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে ভগবৎ কৃপাই সর্বপ্রধান। আমরা গেয়ে থাকি, ''প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণারাম; কী যেন লুকানো নামে মিষ্টি এত তব নাম''— যদি কখনও ভাবের অভাব হয় মনে আসে চাঞ্চল্যতা তাহলেও অভ্যাস দ্বারা নিয়মিত ভাবে মন থেকে প্রতিকূল ভাবগুলি অপসারিত করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই মা-ঠাকুমাদের মুখে শুনতে

অভ্যস্ত হয়েছি আমরা, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরক বাস'—আসলে স্বর্গ বা নরক বলে কিছু আছে কিনা জানা নেই। পরবর্তী কালে ভাব সম্প্রসারণ করেছিলাম, "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর; মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতেই সুরাসুর"—এ বড় দামী কথা।

ছবিদির কথা লিখতে গিয়ে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে—পুরীর মা আনন্দময়ী আশ্রম কোনও একটা বিশেষ কারণে অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল। এবার মায়ের কিছু বিশিষ্ট শিষ্য ভক্তদের একনিষ্ঠ চেষ্টায় আশ্রমটি আবার খোলা হল। ছবিদি আমাকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে। আমি বললাম ঠিক আছে যাব তবে আমি থাকব আমার বাবার আশ্রমে আর যাতায়াত করব। সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় গোকুলবাবা পুরীতে ছিলেন না। আমি আশ্রমেই থাকলাম। পরের দিন ছিল পূর্ণিমা, দিলীপকে বললাম খুব সিন্নি দিতে ইচ্ছে করছে আশ্রমে, কী করা যায়। ও বলল অসীমদার বাড়িতে ৺নারায়ণ আছেন, উনি প্রত্যেক পূর্ণিমায় পুজো করে আশ্রমে সিন্নি পাঠিয়ে দেন। আমি বললাম সেটা ঠিক আছে, তবু আমি পূর্ণিমাতে আছি যখন আমাদের গুরুদেবই স্বয়ং নারায়ণ আমি ব্যবস্থা করে দিলে তুমি কী পুজো করে দেবে? বলল, 'হ্যাঁ'।

কৈলাসকে দিয়ে সব বাজার করালাম, আমি নিজে হাতে সিন্নি মেখে সব জোগাড় করে দিয়ে মা আনন্দময়ী আশ্রমে চলে গেলাম। ফিরলাম যখন তখন দিলীপ আমাকে প্রসাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম অসীমদার বাড়ির প্রসাদ কোথায়? তখন কৈলাস বলল উনি সন্ধেবেলায় ফোন করে জানিয়েছেন ওনাদের কী বাধা পড়েছে তাই আজ ওনাদের বাড়িতে পুজো হয়নি। আমি স্তম্ভিত হয়ে গুরুমহারাজজীর পদপ্রান্তে বসে শুধু এইটুকুই অস্ফুটে বলতে পারলাম, 'হে গুরদেব এ তোমার কেমন লীলা?'

"আমার চরণে দিও ঠাঁই, দিও ঠাঁই,
ওহে গিরিধারী, গিরিধারী, কামনা কিছুই নাই।"

প্রণাম

---

২৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা খুব মনে পড়ছে। তাঁকে স্মরণ না করলে আমার অপরাধ হবে। সে সময়ে আমার পরিবারবর্গকে সাহায্য করায় তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর নাম পশুপতি নাথ ঘোষ। ইনি ডাঃ রাজেন্দ্র রোডের পশুপতিবাবু নন। ইনি বিহার গভর্নমেন্টে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবসর প্রাপ্ত ভদ্রলোক। দেওঘরে বোম্পাস টাউনে গৃহ নির্মাণ করিয়ে সেইখানে বাস করতেন। আমাদের সেই দুঃসময়ে দিনের মধ্যে যে কতবার বোম্পাস টাউন থেকে আমাদের করণীবাদের গৃহে যাতায়াত করতেন তার হিসাব নেই। মহারাজজী তাঁকে আশ্রমের কাজের মধ্যেও টেনে এনেছিলেন। আশ্রম পরিচালনার বিষয়ে কোন কোন সাব কমিটিতে তাঁকে যুক্ত করেছিলেন।

সম্পাদকীয়

"সাধন স্মরণ লীলা"

উপনিষদ বলেন, "এতস্যৈব আনন্দস্যৈব মাত্রামুপজীবন্তি"।

এই জগতে আমরা যতকিছু জ্ঞান আহরণ করি, যেসব কিছু দেখে আনন্দ পাই— ভাবি বুঝি অনেক জেনে গেলাম, তা কিন্তু নয়, সেটা অখণ্ড আনন্দের কণা মাত্র। পূর্ণরূপে জ্ঞানলব্ধ হওয়া বা আনন্দলাভ করা ভগবানকে লাভ করারই সমান।

কিন্তু সেই সাধনা আমরা কতজন করতে পারি যার দ্বারা আমাদের আনন্দ অনন্তদেবে বিস্তার লাভ করতে পারে? আনন্দের পূর্ণতা লাভ আর ভগবান লাভ করা একই কথা। সৎ-চিৎ-আনন্দ— এই স্বরূপগুলি অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যা অনন্ত ব্রহ্ম, এই জন্য বলা হয় ব্রহ্মের তিন পাদ অব্যক্ত, কেবল চতুর্থপাদ নাম রূপের দৃশ্যমান জগৎ ব্যক্ত। সদ্‌গুরু যিনি তিনি যাবতীয় অজ্ঞানতার অতীত; স্বয়ং প্রকাশমান, তাঁর বিচ্ছুরিত আলোর দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার বিনষ্ট হয়। প্রাকৃতিক, জাগতিক, সমগ্র জীবকূল, আকাশ সমুদ্র এই সবকিছুই তাঁদের দৃষ্টিগোচর। আমাদেরতো সে শক্তি নেই, তাই পদে পদে কিছু ভুল তথ্য আমাদের মনে উৎসারিত হয়। যেমন আমাদের গুরুদেব বছরের সমস্ত দিনকেই গুরুত্ব দেবার কথা বলেছেন। তা সত্ত্বেও কোনও বিশেষ বিশেষ দিন পালন করে তিনি আমাদের মধ্যে কিছু সংস্কারও প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন— এটাতো আর অস্বীকার করা যায়না। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনধারাও বিভিন্ন ঋতুতে সেই সাজেই সেজে ওঠে।

বসন্ত দিয়ে বছর শেষ আর গ্রীষ্ম দিয়ে তার শুরু— এমনটাই প্রাকৃতিক বিভাজন সত্যিই দেখার মত। গ্রীষ্মের শুরু হচ্ছে বৈশাখ মাস থেকে। চৈত্রের ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টালেই আসে বৈশাখ। তাহলে কী মাত্র একটা দিনের ব্যবধান? ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, যেহেতু নতুন একটা বছর শুরু হ'চ্ছে তাকে আবাহন করার জন্য আমাদের এই বর্ষবরণ রীতি। বাঙালীরা তাই বৈশাখস্য প্রথম দিবসে বিভিন্ন রকম নতুন বস্ত্রে নিজেকে সাজিয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিতে মেতে ওঠে। ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মী-গণেশ পুজো করেন তাঁদের এইদিন থেকে শুরু হয় হালখাতা। আর আমরা আমাদের গুরুদেবকে নিয়ে মেতে উঠি বর্ষবরণের আনন্দের উৎসবে। তিনিই বলেছেন, "প্রকট-অপ্রকট লীলা দুইতো বিধান," তাই আশ্রমে আশ্রমে নিজেদের বাড়িতে সকলেই এই দিনটিতে দিব্য আনন্দের মূর্ত প্রতীক সেই শ্রীগুরু দেবের শ্রীচরণে বারে বারে নতশিরে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করি, "হে গুরুদেব! তোমার সকল সন্তানদের তুমি চেতন শক্তি জাগিয়ে তাদের আরও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাও।"

শ্রীগুরু চরণে শতকোটি প্রণাম।।